চাঁদের জানালা

আশাপূর্ণা দেবী

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র : ১৩৬৬

প্রকাশক : প্রবীর মিত্র : ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলিকাতা-৯
প্রচ্ছদ : অলোকশঙ্কর মৈত্র
মুদ্রাকর : গোপাল পাল : স্টার প্রিন্টিং প্রেস
২১/এ, রাধানাথ বোস লেন : কলিকাতা-৬

চাঁদের জানালা

ত অনেকটা হয়ে গেছে।

জে ওঠার সময় লক্ষ্য পড়েনি, ব্রীজ পার হয়ে রাস্তায় নেমে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে ছায়ামূর্তিটায় চোখ পড়লো গৌতমের।

তমের বাঁ ধার ঘেঁষে হেঁটে চলেছে।

তমের থেকে অনেকখানি লম্বা।

ন থেকে যে ও সঙ্গ নিয়েছে টের পায়নি গৌতম, হঠাৎ ড়ে যেতেই কেমন যেন চমকে উঠলো।

হলো হঠাৎ যেন কোনো ভুলে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া, ড় পরিচিত কাকে দেখলো। থেমে পড়লো গৌতম।

টাও থেমে পড়লো।

তম ওর দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে রইলো একটুক্ষণ, চেষ্টা করলো ওর ঠোঁটে তামাকের পাইপ আছে কিনা।

তে পেলো না।

ের ঠোঁটটা একবার কামড়াল গৌতম, তারপর আবার লাগলো আস্তে আস্তে।

মূর্তিটাও আবার চলতে লাগলো ঠিক গৌতমের পায়ে ধার ঘেঁষে। তার মানে গৌতমের আকাশে এখন ডান-দ!

র আলোতেও ছায়া পড়ে? আশ্চর্য তো!

টা বোধহয় জানা ছিল না গৌতমের। হয়তো গৌতম এর কানোদিনে জ্যোৎস্নারাত্রে, একটু বেশী রাত্রের নির্জন রাস্তায় া একা আস্তে আস্তে হাঁটেনি।

ৎস্নরাত্রি! চাঁদের আলো!

গৌতমের মনের কোণে একটু বাঁকা ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠলো। …চাঁদ মহাশয়, তোমার আর কিছু নেই! যে ব্যাঙ্কে সর্বস্ব ছিল, সেই ব্যাঙ্কটি ফেল্ হয়ে গেছে। তোমার পূর্ণিম টাত বেবাক মুছে গেল। মানুষ শুধু তোমার বুকে পা রেখে আসেনি, তোমার হৃৎপিণ্ডে তীক্ষ্ণ যন্ত্র পুঁতে রেখে তোমার হৃদ্‌স্পন্দনের হিসেব রাখবে বলে।

তার মানে, হে চির রহস্যের রাজা, স্রেফ দেউলে হয়ে গে তুমি।

অথচ মানহীন মর্যাদাহীন রহস্যহীন তুমি, এখনো পু নিয়মে তিথির হিসেব কষে কষে সমুদ্রে জোয়ার-ভাঁটা তু পথ চলতে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে এগোতে থাকবে প্রিয় বন্ধুর মতো।

তোমার এ ডিউটির শেষ হবে না।

'ডিউটির কী শেষ আছে? মৃত্যুর মুহূর্তটিতে পর্যন্ত ডিউটির ছুটি নেই।'

কে বলেছিস একথা? ভারী ভারী ভরাট গলায়!

'মুক্তি! মুক্তি! রাতদিন কেবল মুক্তির চিন্তায় ছটফট মুক্তি কথাটার মানে জানো? দায়িত্ব থেকে মুক্তি নেবে কিন্তু নিজের কাছ থেকে?'

কার গলা এটা?

প্রাচীন ভারতের আদর্শ আঁকড়ে থাকা এক ব বৃদ্ধের না?

রাস্তায় বাঁক নিতেই ছায়ামূর্তিটা অন্তর্হিত হয়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ অনেক দিন পরে বাবার কথা গেল গৌতমের।

দীর্ঘদেহী হাস্যোজ্জ্বল এক পুরুষ।

'প্রকৃতির মধ্যে প্রাবল্য আছে, কিন্তু সে প্রাবল্য অধিকারকে খর্ব করতে এগিয়ে আসে না, শুধু সমষ্টি প্রতিকূ স্রোতের বেগে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।'

বাবাকে দেখতে পেলো গৌতম।

সকালবেলা বাগানে বেড়াচ্ছেন!

পরনে রাতের পোশাক, মুখে তামাকের পাইপ।

বাগানের মধ্যেকার ছবির মতো সুন্দর বাড়িটার সুন্দর বারান্দায় ছোট ছেলে ঘুমভাঙা চোখে দেখছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তার বাবার পায়ে পায়ে হেঁটে চলেছে একটা দীর্ঘ ছায়া।

ছায়াটার মুখেও তামাকের পাইপ, ধোঁয়া বেরোচ্ছে তা থেকে, সেটাই দেখছে ছেলেটা পরম কৌতুক আর কৌতূহলের দৃষ্টিতে।

ওই বাগানওলা বাড়িটা কোথায়? ঘুরতে ঘুরতে কোনখানে গিয়ে হয়েছিলেন তখন বাবা? কবেকার ছবি ওটা?

বাবার কথা মনে এলেই জোর করে সেই মনে আসাটাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করে গৌতম। না করে কী করবে? বাবার কথা মনে পড়ে গেলেই এখনো যে ভয়ানক একটা কষ্ট হয় গৌতমের! মাথার মধ্যে না কোথায়, যেন মুঠোয় চেপে ধরার মতো একটা যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়। আর চোখ দুটো বালির মতো ভীষণ জ্বালা করতে থাকে।

এই অনুভূতিটা বড় ভয়ের।

গৌতম তাই ওটা আসবার আগেই ঠেলে সরাতে চেষ্টা করে।

কিন্তু আজ পারছে না সরাতে।

আজ ওই ছায়াটা যেন গৌতমকে ছেলেমানুষের মতো দুর্বল করে দিয়েছে। তাই ছায়াটার ঠোঁটে তামাকের পাইপ খুঁজছে।

অথচ ছায়াটা গৌতমের নিজের।

বিনুমাসীর ওই বোকার মতো কথাটাই কি গৌতমকেও আজ বোকা করে দিয়েছে?

বাংলার বাইরে থাকে বিনুমাসী, অনেকদিন অনেকদিন পরে এবার বারো তেরো বছর পরে এসেছে। বাবা মারা

যাওয়ার পর আর মা'র সঙ্গে দেখা হয়নি বিনুমাসীর। এতো
পরে হলো।

তাই এতোদিন পরে দেখা হওয়াটা তারিয়ে তারিয়ে অ
করবার জন্যে অনেকবার চেষ্টা করলো বিনুমাসী বোনকে জ
ধরে কাঁদবার, কিন্তু সেই ধরার সুযোগটা দিলো না মা।
হাত এড়িয়ে এড়িয়ে দিব্যি কেটে পড়লো।

বিনুমাসী অতঃপর বোনের ছেলেটাকে নিয়ে পড়লো। বললে
'ইস, কতো বড়ো হয়ে গিয়েছিস তুই গৌতম! আর কী
বাবার মতো লম্বা হয়েছিস দেখছি। আর শুধু লম্বাটুকুই বা কে
নাক, মুখ, চোখ, চুল সব কিছুই অবিকল বাপের মতো
মনে হচ্ছে যেন রাজাকেই দেখছি।…ঠিক তোর মতোই দেখা
ছিল তোর বাবা বিয়ের সময়। সেই দেখাটাই আসন দেগে আ
মনের মধ্যে। কতো বয়েস হলো তোর? কুড়ি? কি
বিয়ের সময় তোর বাবার তেইশ বছর বয়েস ছিল।'

বার বার ওই একটা কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছিল,
গৌতম অবিকল তার বাবার মতো দেখতে।

এই কথাটা এতো বিস্তার করে বলবার কী ছিল
গৌতম।

গৌতমের খুব খারাপ লাগছিল।

গৌতমের মনে হচ্ছিল, মানুষ কি করে একজন মরে-
মানুষের কথা এতো সহজে বলতে পারে! এতো সহজে উ
করতে পারে তার নাম! অথচ বিনুমাসী অবলীলায় করেছিল।

ইচ্ছে করে বলবার জন্যেই বলছিল যেন।

কেন?

বিনুমাসী কি ভেবেছিল বাবার নাম আর বাবার গল্প শু
আহ্লাদ হবে গৌতমের? হয়তো তাই ভেবেছিল। যার
বুদ্ধি!

অথচ গৌতমের মনে হচ্ছিল মামাদের ওই ফার্ন

টার সাজানো গোছানো ড্রইংরুম থেকে উঠে ছুটে পালিয়ে আসে। মনে হচ্ছিল বাবার নামটার পবিত্রতা নষ্ট করছে বিনুমাসী।

ঢাকুরিয়ার একটা গলির মধ্যে সামান্য চেহারার একখানা দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো গৌতম, হাতের ঘড়িটা দেখলো, একটু ইতস্তত করলো, তারপর আস্তে দরজার পাশের কলিং বেল্‌টা টিপলো।

ছোট্ট একটা চাকর এসে দরজা খুলে দিলো, এবং মুখের ইসারায় ও হাতের ভঙ্গীতে জানিয়ে দিলো, বাড়ির কর্তা গৌতমের ফিরতে দেরী হওয়ায় চিন্তিত অথবা ক্রুদ্ধ। অতএব সাবধান!

ছেলেটা ওটুকু না বললে হয়তো গৌতম অপরাধীর মনোভাব নিয়েই মাতুর কাছে গিয়ে দাঁড়াতো, কিন্তু ছোট্ট ওই ছেলেটার সাবধানবাণী গৌতমকে কঠিন করলো। গৌতম শক্ত হলো।

গৌতম ভাবলো, কী আশ্চর্য! আমি একটা কচি খোকা নাকি কোনো কারণেই কোনোদিন রাত দশটায় বেড়িয়ে ফেরার স্বাধীনতা আমার নেই? কেন, আমি কি বলে যাইনি 'মামার বাড়ি' যাচ্ছি? মা ডেকে পাঠিয়েছে?

যেখানে গৌতমের মা আছে, গৌতম সে বাড়িটাকে বর্জন করতে পারে না অবশ্যই।

যুক্তি খাড়া করবার জন্যেই কথাটা ভাবলো গৌতম, কিন্তু 'যেখানে আমার মা আছে' এই কথাটা ভাবতে গিয়ে মনে হলো যেন ও যেন একটা শূন্যের উপর পা রাখলো।

ছেলেবেলায় প্রায়ই একটা স্বপ্ন দেখতো গৌতম। দেখতো, দীর্ঘ সময় ধরে একটা সিঁড়িতে উঠছে সে, সিঁড়ির পর সিঁড়ি, ফুরোতেই চায় না।

অবশেষে এক সময় সিঁড়ি শেষ হতো, একটা বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়তে হতো গৌতমকে।

এটা তাহলে ছাদের দরজা, ভাবতো গৌতম, তারপর আ
দরজাটা খুলে পা বাড়াতো, আর শিউরে উঠতো।

দরজার বাইরে ছাদ নেই, শুধু ফাঁকা। গভীর একটা গহ্বর
পা নেমে যাচ্ছে। অদ্ভুত সেই অনুভূতিটায় ঘুম ভেঙে যে
গৌতমের।

আজ হঠাৎ সেই অনুভূতিটা যেন ধাক্কা দিয়ে গেল গৌতমকে,
যখন গৌতম ভাবলো দাদুকে শুনিয়ে দেবো, 'সেখানে আমার মা
আছে।'

কিন্তু গৌতমের শানানো অস্ত্রশস্ত্রগুলো কোনো কাজে লাগলো
না। দাদু ওর ওই দেরীটা নিয়ে কোনো প্রশ্নই করলেন না।
এ কথাও বললেন না, 'মা কেন ডেকেছিল?'

অবশ্য এটা বলার কথা নয়।

দাদু কোনোদিনই নিজে থেকে গৌতমের মায়ের কথা তোলে
না। পিসিও না।

তার মানে, গৌতমদের এই বাড়িতে সহজে কোনোদিন গৌতমের
মা-বাবার নাম উচ্চারিত হয় না। যেন এ পৃথিবীতে কেবলমা
গৌতমের দাদু আছে, পিসি আছে, আর গৌতম আছে। গৌতমের
যেন কোনো অতীত ছিল না।

তা গৌতমও তো সেই অতীতকে একটা পুরু ধুলোর স্তর
নীচে চাপা দিয়ে রাখতে চায়। ধুলোটা একটু সরিয়ে দেখতে
গেলেই যে সেই এক হাস্যোজ্জ্বল দীর্ঘদেহী পুরুষের ছবি ঝল
ওঠে! আর গৌতমের চোখ দুটো হঠাৎ খুব জ্বালা
ওঠে!

দাদু কোনো প্রশ্ন করলেন না, শুধু একটা খবর দিলে
বললেন, 'তুমি যখন ছিলে না, একটি মেয়ে তোমায় খুঁজ
এসেছিল।'

গৌতম চমকে উঠলো।

টুমু কি পাগলা হয়ে গেছে নাকি? তাই দু'দিন দেখা হয়নি

...লে বাড়িতে এসে হানা দিয়েছে? টুনু কি জানে না গৌতমের দাদু কী পরিমাণ সেকেলে। জানে না, গৌতমের পিসি খবরের গন্ধ পেলেই পুরো ঘটনাটা অনুমান করে নিতে পারে। আর সে অনুমানটা প্রায়ই নির্ভুল হয়।

গৌতম তবু নিজেকে সামলে নিলো।

জলের গ্লাশে হাত ধুতে ধুতে নির্লিপ্ত গলায় বললো, 'মেয়ে! কই কারো তো খুঁজতে আসার কথা ছিল না। নাম বলেছে?'

'ভাল নাম বলেনি', দাদুও নির্লিপ্ত গম্ভীর গলায় বলেন, 'বললো, বলবেন টুনু এসেছিল, তাহলেই বুঝতে পারবে।'

দাদুর ভাষায় কোনো অভিযোগ ছিল না, ভঙ্গীতেও না। তবু গৌতমের মনে হলো, দাদু যেন খুব একটা ব্যঙ্গ মাখানো ধিক্কার দিলেন গৌতমকে। যেন বলে উঠলেন, 'তলে তলে তাহলে এতোদূর এগোনো হয়েছে? 'টুনু' এসেছিল বললেই বুঝতে পারবে!'

তার মানে ডাকনামে ডাকাডাকির স্টেজে এসে গেছ!

গৌতম তবুও সামলাতে চেষ্টা করে। বলে ওঠে, 'টুনু! সেই কালো রোগা দাঁত-উঁচু মেয়েটা? বকবক করে গেল তো খুব?'

দাদু রুটির গোছা দুধের বাটিতে ভরতে ভরতে বলেন, 'আমার সঙ্গে আর কী বকবক করবে?'

খুব সাধারণ কথা।

তবু গৌতমের মনে হলো, ওর অন্তরালে আরো অনেকগুলো কথা ঢুকিয়ে দিলেন দাদু। সেই কথাগুলো হচ্ছে, আমার সঙ্গে বকবক করতে তো আর আসেনি, এসেছিল তোমার সঙ্গে বকবকম করতে।...তার মানে, এতোদিন ধরে বৃথাই ভস্মে ঘি ঢাললাম আমি। তুমি ঠিক তোমার পথেই চলেছো। মাতৃরক্তের ঋণ-শোধ না করে গতি নেই তোমার।

এর একটা কথাও উচ্চারণ করেননি দাদু, তবু গৌতম যেন প্রত্যেকটি কথা স্পষ্ট শুনতে পেলো। গৌতম কি কোনো দৈবীশক্তি লাভ করছে? তাই অনুক্ত কথাগুলোও শুনতে পাচ্ছে?

গৌতমের দাদুর বাড়িতে এখনো খাবার টেবিল ঢোকেনি। কার্পেটের আসন পেতে খেতে বসেছে তিনজনে—দাদু, পিসি আর গৌতম। পাশাপাশি নয়, এক লাইনেও নয়, তিনজন তিন কোণায়। বরং বলা যায় মুখোমুখি বসেছে।

দাদুর বসবার আসনটা প্রকাণ্ড।

পিসি নিজে হাতে করে বুনেছে, লম্বা লম্বা ঝালর লাগিয়ে। অতবড় বিশাল দেহ মানুষটা বসা সত্ত্বেও চারিদিকে ছড়িয়ে আছে ঝালরগুলো। গৌতম নিজের মনে আস্তে রুটি ছিঁড়ছিল, দাদুর দিকে তাকাতে পারছিল না। তবু গৌতম বুঝতে পারছিল, এখন দাদু তাঁর ঈষৎ শিরা-ওঠা বলিষ্ঠ হাতের থাবাটা দিয়ে মস্ত বড় কাঁসার বাটিটার মধ্যে চটকে চটকে রুটি মাখছেন দুধ দিয়ে, আমসত্ত্ব আর চিনি দিয়ে। এগুলো চাই-ই দাদুর। ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাত যাই হোক বাজারে, পিসি ঠিক মজুত রেখে দেবে দাদুর অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো। দাদুর প্রয়োজনীয়ের সংখ্যা খুব বেশী নয়, কিন্তু যেগুলো প্রয়োজন সেগুলো একেবারে 'অবশ্য প্রয়োজন'।

দাদুর দুপুরের ভাতের পাতে কোনো একটা তেতোর আয়োজন নেই, অথবা থালার পাশে ঘরে পাতা দইয়ের বাটিটা নেই, এ যেমন ভাবা যায় না, তেমনি ভাবা যায় না দাদুর আঁচানোর পরই তাঁর সামনে একটা মুখকাটা ডাব নেই।

গৌতম ভাবতেও পারে না, কী করে কোনো একটা মানুষ প্রতিদিন একই জিনিস খেয়ে চলেছে। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর।

গৌতম জানতেও পারে না প্রতিদিন জিনিসগুলো জোগাড় করে রাখা হয় কী ভাবে। দাদু সম্পূর্ণ পিসির পোষ্য।

পিসি যেন বাঘিনীর শাবক আগলানো মনোভাব নিয়ে দাদুকে আগলে রাখে।

টুনুর কথাটা শেষ হয়ে যাবারই কথা, তবু গৌতম ঘটনা

ড্রেটায় আরো একটা মিহি সেলাই দিতে চেষ্টা করে। টুনুর াসার একটা কারণ প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই বুঝি সেলাইটা পড়ে।

অতএব গৌতম বলে, 'কোনো বইটই চাইলো নাকি মেয়েটা ?'

এবার পিসি কথা বললো।

বললো, 'চাইলে কি আর বাবার কাছে চাইবে ? তবে খুব প্রতিভ মেয়ে বাবা।'

গৌতম বলতে পারতো, 'অপ্রতিভই বা হতে যাবে কেন ?' ারলো না। গৌতমের কানটা লাল হয়ে উঠলো। আর টুনুর পর রাগে হাড় জ্বলে গেল।

কী দরকার ছিল তোমার এখানে, এই সেকেলে বাড়িটায় এসে জেকে বিকশিত করবার ? তুমি যে একটি মস্ত 'কথকী' সেটা কা গৌতম জানলেই কি যথেষ্ট নয় ? গৌতমের বাড়িসুদ্ধ সবাইকে ানাতে হবে ? রোসো, কাল তোমায় মজা দেখাচ্ছি।

পিসির কথার কোনো উত্তর দিল না গৌতম, সামনে দাঁড়ানো সই ছোট্ট চাকরটাকে বললো, 'এই সাধন, জল দে।'

গৌতমের জলের কুঁজোটা সাধনের এলাকা। ভাঁড়ার ঘরে কোথায় যেন একটা বিশুদ্ধ কলসী আছে, তাতে পিসির আর দাতুর খাবার জল থাকে। পিসি মাছ খায় না বলে দাদুও খায় না। যদবধি পিসি বিধবা হয়েছে তদবধিই দাতুর এই কৃচ্ছ্রসাধন।

তখন দাহু কোথায় যেন থাকতেন, গৌতম সঠিক জানে না। গৌতমের শুধু মনে পড়ে, গৌতমের বাবার সেই বাগানঘেরা কোয়ার্টার্সের বাড়িটার বারান্দায় বসে পাইপটা হাতে রেখে বাবা লেছিল, 'এ কৃচ্ছ্রসাধনের তুলনা হয় না। বাবার খাওয়া-দাওয়ায় থেষ্ট বিলাস ছিল। মাংস ছাড়া চলতোই না।'

কথাটা বলবার সময় বাবা কোন মুখে বসেছিল, তাও স্পষ্ট মনে কাছে গৌতমের। আর এও মনে আছে, শুনেই মা ঠিক স্প্রীঙের তো ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠে বলেছিল, 'আমার মতে এটা স্রেফ ামী। অথবা ছেলে ভুলোনো প্রতারণা।…বিভার আবার বিয়ে

দেওয়া উচিত ছিল বাবার। তা নয়, তার বৈধব্যের দুঃখ নিবা
করতে নিজে বৈধব্য নিলেন। হাস্যকর! স্রেফ হাস্যকর! তু
আবার এই নিয়ে বড়াই করছো।'

গৌতম বারান্দার একধারে একটা তুলোর খরগোশ নি
খেলছিল। মা আর বাবা বোধ হয় ভেবেছিল, গৌতম কিছুই শুনত
পাচ্ছে না। কিন্তু গৌতম সবই শুনতে পাচ্ছিল। গৌতম সব
শুনতে পেতো। খেলতে খেলতেই শুনতে পেতো। এমন ি
রাত্রে যখন ঘুমিয়ে থাকতো তখনও যেন গৌতম কতো সব ক
শুনতে পেতো মা আর বাবার। বেশী বেশী মায়ের গলাটা
শুনতে পেতো।

প্রায়ই একটা কথা শুনতো গৌতম, উত্তেজিত গলা, 'ফুলে
বাগান, ভালো বাড়ি, দাসদাসী, আসবাব! ধুয়ে জল খাবো
সোসাইটি আছে এখানে? সোসাইটি? মানুষ বাঁচতে পা
এখানে?'

বাবার হাসির গলা। 'তা হলে বলো এখানে যারা আছে
তারা স্রেফ মরে ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে?'

মায়ের গলা আরো উত্তেজিত শোনাতো, 'ভূতেদের আর ভূ
হবার জন্যে নতুন করে মরতে হয় না। মানুষ আছে এখানে
জলজ্যান্ত রক্তমাংসের মানুষ?...নেই। আছে শুধু তোমার ম
কাজের যন্ত্র।'

কথাগুলোর মানে বুঝতো না তখন গৌতম, জানতো ন
সোসাইটি কাকে বলে। তবু আবছা ভাবে যেন বুঝতে পারতে
মা সুখী নয়, সন্তুষ্ট নয়। গৌতম তখন ধরে নিতো, মা ভীষ
রাগী।

আর সেই রাগের কারণের কোনো ঠিকঠাক নেই। না হ
দাদুর কৃচ্ছ্রসাধন নিয়ে বাবা যদি কিছু গৌরব করেই থাকে, মা
রেগে ওঠবার কী ছিল?

অন্য অন্য সময় মা রেগে উঠলে, কতোদিন দেখেছে গৌ

বা টপ করে মাকে একহাতে তুলে ধরে উঁচু করে দোলাতো।
 রেগে চীৎকার করে একশা করতো, তখন বাবা নামিয়ে দিয়ে
সে হেসে বলতো, 'রাগ কমলো ?'

কিন্তু সেদিন বাবা হাসেওনি, মাকে তুলেও ধরেনি। গম্ভীর
কটু হেসে বলেছিল, 'বাবা দিতে চাইলেই বিভা বিয়ে করতো ?'

'করতো না হয়তো ! হিন্দু নারীত্বের মহিমার আফিং খাইয়ে
ইয়ে মানুষ করা হয়েছে তো ! মনকে চোখ ঠেরে ঠেরে সেই
হিমার পরাকাষ্ঠা দেখাতে হবে বৈকি ! স্রেফ 'শো' !'

বাবা আর একটু হেসে বলেছিল, 'তুমি অবশ্য ও সব 'শো'
রতে যাবে না। আমি মরলে তৎক্ষণাৎ আর একটা বিয়ে করেই
ফলবে।'

মা গা থেকে খসে পড়া আঁচলটা ঝাপট মেরে পিঠে ফেলে
করে চলে যেতে যেতে বলে গিয়েছিল, 'তার জন্যে কারুর পরামর্শের
রকার নেই।'

গৌতমদের সেই সুন্দর কোয়ার্টার্সের বাড়িটায় মাকে কদাচ
াসি-খুশি দেখেছে গৌতম। বাইরের কেউ বেড়াতে এলে মা খুব
াসতো। নচেৎ নয়। কিন্তু এখন ? মা'র দাদাদের ওই ফার্ন
রাডের বাড়িটায় ?

একটা বাচ্চা মেয়ের মতো হেসে গড়িয়ে হৈ চৈ করে বেড়ায়

আজ যখন গৌতম গিয়ে গেট খুলে দাঁড়ালো, মা তখন পোর্টি-
কার সামনে খোলা বারান্দায় একটা কুকুর ছানার পিছনে ছুটোছুটি
রছে। বিনুমাসীর কুকুরে ভয়, মা'র তাই মজা। কুকুরছানাটাকে
রে বিনুমাসীর গায়ে ফেলে দেবে বলে অতো হুড়োমি করছে।

গৌতম গিয়ে দাঁড়ানোর পরও মা অনেকক্ষণ তাকে দেখতেই
েলো না, লাফালাফিই করতে লাগলো। তারপর হাঁফাতে হাঁফাতে

আর শাড়ির আঁচল গোছাতে গোছাতে বললো, 'গৌতম এসেছিস্, বোস।'

গৌতম বলেছিল, 'ডেকেছ কেন?'

মা উত্তর দেবার আগে বিনুমাসীই উত্তর দিয়ে বসেছিল, 'মা ডেকেছে তার আবার কেন কি বাবা?'

গৌতম দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'দরকার না হলে ডাকবার কোনো মানে নেই।'

বিনুমাসী এগিয়ে এসেছিল।

চট করে একঝলক জলও চোখে এনে ফেলেছিল বিনুমাসী। গৌতমের গায়ে একটা হাত রেখে সেই জলভরা চোখে তাকিয়ে বলেছিল, 'ছি বাবা, ওভাবে কথা বলতে আছে? মা'র মনের অবস্থা ভাবো? ভেতরের আগুন চাপা দিতে হৈ চৈ করে বেড়ায় বৈ তো না।'

গৌতম নিজের শরীরটা ওঁর হাতের আওতা থেকে সরিয়ে নিয়ে ড্রইংরুমে এসে বসেছিল। আর বিনুমাসী শুরু করেছিল, 'দেখ্ তুমি তাকিয়ে দেখ্, যেন সত্য 'সে' বসে রয়েছে। অবিকল বাপের চেহারা।'

মা বলেছিল, 'তুমি যতোটা বলছো ততোটা নয় বাবা। তবে আছে আদল।'

বিনুমাসী মাথা নেড়েছিল, 'সে তোরা সর্বদা দেখছিস বলে বুঝতে পারিস না। আমি অনেকদিন পরে দেখছি তো। যেন অবিকল—রাজা।'

গৌতমের বাবার পুরো নামটা ছিল রাজেন্দ্রনারায়ণ, কিন্তু সংক্ষিপ্ত ডাকনামটাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল আসল।

সবাই বলতো 'রাজা'। ওদের সেই বিদেশের বাড়িতে বাবার সহকর্মীরাও এসে ডাক পাড়তো, 'রাজা আছ? রাজামশাই!'

বাবা মাকে বলতো, 'তুমি অতএব রাণী! মহারাণী!'

'মহারাণী' বলেই মাকে ডাকতো বাবা!

ফার্ন রোডের বাড়িতে এরা মাকে মা'র সত্যি নাম ধরে ডাকছে। শুমিতা।

বিনুমাসীর নাম বোধহয় বিনতা।

বড়মাসী না বলে গৌতম কেন বিনুমাসী বলে. তা জানে না। বোধহয় ঠিক সাধারণ লোকের মতো যথাযথ ডাকটা অ্যারিস্টোক্র্যাসি নয়, তাই।

ফার্ন রোডের এই বাড়িটায় ঠিকমতো সম্পর্ক হিসেবে কেউ কাউকে ডাকে না।

মা তার দাদাদের স্রেফ নাম ধরে ডাকে। বৌদিদের বলে 'লাল গোলাপ' আর 'নীল গোলাপ'।

মা'র দাদাদের ছেলেমেয়েরা মাকে 'পিসি' না বোলে বলে 'সাই'।

এ বাড়িতে দাদু নেই, দিদা আছেন, তাঁকে নাতি-নাতনীরা বলে 'বুলবুলি পাখি'।

গৌতমও বলে। কেন বলে তা জানে না।

বুলবুলি যে দিদিমার নাম নয় তা জানে। কিন্তু ওই কেন-টা নিয়ে কোনোদিন মাথা ঘামায়নি গৌতম। মামার বাড়ির সব কিছুই একটু বিদঘুটে তা দেখছে বলেই হয়তো অকারণ মাথা ঘামায় না।

আগে ছেলেবেলায় ভাবতো 'কেন এরকম'।

বাবার সঙ্গে ছুটির সময় সে আসতো। বাবা চলে যেতো তার মার কাছে, মা আর গৌতম এ বাড়িতে থাকতো।

বাবা এক-একদিন আসতো।

হেসে হেসে বলতো, 'অসাধারণ হবার ভারী ইচ্ছে এদের, বুঝলি গৌতম? কিন্তু অসাধারণ তো ইচ্ছে করলেই হয় না, ঘটে কিছু থাকা দরকার! তা ঘটে তো মা ভবানী! তাই এরা 'না-সাধারণ'এর সাধনা করছে। দেখ্ না ঐদের আপাদমস্তক 'না-সাধারণ'!'

অথচ এই বাড়িটা মায়ের মনের মতো।

তখনও তো দেখেছে। একমাস দেড়মাস ছুটির মধ্যে বাবা হয়তো একটা দিন মাকে ধরে নিয়ে গিয়ে তুলতো ঢাকুরিয়ার দাছুর বাড়ি। তাও মা রাত্রে থাকতো না, পালিয়ে আসতো।

শুধু বাবা মারা যাওয়ার পর যখন ওদের সেই কোয়ার্টার্সের বাড়িতে দাছু গিয়ে হাজির হলেন নিয়ে আসতে, আর মামারা টেলিগ্রাম করলেন, 'ছুটি পেলাম না, যেভাবে হোক চলে এসো। এসে এখানে ওঠো—'

তখন মা দাছুর বাড়িতে গিয়েই উঠলো। কে জানে শ্বশুরের ভয়ে না ভাইদের ওপর অভিমানে। না কি বাবার টাকাকড়িগুলোর বিলি-ব্যবস্থার জন্যে? কি সব যেন কাগজপত্র দাছুই নিয়ে এসেছিলেন বাবার অফিস থেকে।

গৌতমের মনে আছে, মাকেও তখন পিসির মতো সরু সরু পাড়ের শাদা শাড়ি পরতে হতো। গৌতমের বিচ্ছিরি লাগতো। গৌতমের কান্না পেতো। মাকে দেখতে ভয় করতো।

কিন্তু এখন?

এখন তো মা নতুন বিয়ের কনেকেও হার মানাচ্ছে। চুলটা আর চেহারাটা নিয়ে যতো পারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে। গৌতমের কি খুব ভাল লাগছে? গৌতমের মাকে দেখে আনন্দ আসছে? চোখ জুড়োচ্ছে? ভয় করছে না?

গৌতম জানে না। জানে না সে আসলে কী চায়।

পিসির সরু পাড়ও তার যতো অসহ্য, ততো অসহ্য মায়ের ওই জরির আঁচলা লাল, নীল, সবুজ, হলদে।

গৌতম নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে অনেক সময়। বলে, গৌতম, আসলে তুমি চাও কি? তোমার পিসি যখন দূরে দাঁড়িয়ে তদারক করে সাধনকে দিয়ে ভাইপোর জন্যে ডিম সেদ্ধ করায়, মাছ রাঁধায়, আর একটুখানি ছোঁয়া লাগলেই চান করতে ছোটে, তখন কি তোমার রাগে হাড় জ্বলে যায় না? অথচ আবার যখন তোমার মা তার দাদা-বৌদির সঙ্গে এক টেবিলে বসে মুরগীর ঠ্যাঙ চিবোয়? তখন?

তখন কেন সে দৃশ্য দেখে সারা শরীরের মধ্যে খুব একটা বমির ইচ্ছে পাক দিতে থাকে তোমার?

কতোদিন যেন ছিল গৌতম মায়ের সঙ্গে একসঙ্গে দাতুর বাড়িতে? যে বাড়িটা দাতুরও পৈতৃক আমলের।

কতোদিন, ঠিক মনে নেই।

তবে মনে আছে, পিসিতে আর মায়েতে কিছুতেই যেন মিল হতো না। কেবল তুজনে কথা কাটাকাটি হতো। মা ঠিকরে উঠে ছাদে গিয়ে বসে থাকতো, খেতো না। নীচে নামতো না। দাতু ডাকতে যেতেন। ভারী ভারী গম্ভীর গলায় বলতেন দাতু, 'মেয়ের হয়ে তোমার কাছে আমি হাত জোড় করছি বৌমা!' বলতেন, 'ভেবে দেখো বৌমা, গৌতমকে তোমায় মানুষ করে তুলতে হবে। একটা বড় লক্ষ্যর জন্য অনেক ছোট ছোট ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।···গৌতম তোমার সেই বড় লক্ষ্য।'

কিন্তু মা সেই বড় লক্ষ্যর দিকে লক্ষপাত করতো না।

মা দাতুর মুখের ওপর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতো, 'আপনার বংশের ংশধরকে আপনিই 'মানুষ' করে তুলুন। আপনার সনাতন পদ্ধতিতে, রতীয় ভাবধারায়, যা খুশি। আমায় মুক্তি দিন। মুক্তির জন্যে ়াণ হাঁপিয়ে উঠছে আমার।'

তখন একদিন সেই ভারী ভারী ভরাট গলাটা শুনতে পেয়েছিল তম, 'মুক্তি মুক্তি! রাতদিন কেবল মুক্তির জন্যে ছটফট! ক্তি কথাটার মানে জানো?···দায়িত্ব থেকে মুক্তি নেবে তুমি, কিন্তু জের কাছ থেকে?'

তারপর একদিন মা বাক্স-টাক্স নিয়ে চলে গেল। বুলবুলি পাখির এই ফার্ন রোডের বাড়িতে এসে উঠলো।

কতোদিন যেন মাকে আর দেখতেই পেলো না গৌতম।

কতোদিন পরে হঠাৎ একদিন বুলবুলি পাখি এলো এ বাড়িতে। াতুর কাছে বসে রুমালে চোখ মুছতে মুছতে বললো, 'মায়ের প্রাণ! ছেলেটাকে একবার চোখের দেখা না দেখতে পেলে—'

দাদু বললেন, 'আমি তো তাঁকে এখানে আসতে নিষেধ করিনি ?'

বুলবুলি পাখি করুণ গলায় বললো, 'ভয়ে আসতে পারে না সে।'

'ভয়ে! কিসের ভয়ে ?' দাদু খুব বিস্ময়ের গলায় বললেন কথাটা।

বুলবুলি পাখি তাড়াতাড়ি বললো, 'না, অন্য কিছুর ভয়ে নয়, নিজের কৃতকর্মের ভয়েই। আপনার সঙ্গে তো ভাল ব্যবহার করে যায়নি।'

দাদু খুব আশ্চর্যের গলায় বললেন, 'সেকী! কে বললে একথা ? কারুর সঙ্গেই কিছু খারাপ ব্যবহার করেননি তিনি। শুধু এখানে তাঁর অসুবিধে হচ্ছিল বলেই—'

বুলবুলি পাখি বললো, 'আপনি মহানুভব, তাই একথা বলছেন। আমি তো আমার নিজের মেয়েকে জানি। তবু আমারও তো মায়ের প্রাণ। মনমরা হয়ে বেড়ায় মেয়েটা। একদিনের জন্যে ওকে নিয়ে যাই আমি।'

'ও যদি যেতে চায় আমার আপত্তি কি ?'

বলে গৌতমের দিকে শুধু তাকিয়েছিলেন দাদু। খুব স্বচ্ছ পরিষ্কার চোখে।

তবু গৌতম বোধকরি তার সেই অলৌকিক ক্ষমতার বলেই অনুভব করেছিল, দাদু বলছেন 'কি গো, যাবে নাকি ? সেই তোমার মেম মায়ের কাছে ? যে তোমাকে ত্যাগ করে চলে গেছে নিজের স্বার্থ সুখ আমোদ আহ্লাদের জন্যে ? তোমাকে বাদ দিয়েই যে তার নতুন জীবনের কাঠামো বেঁধেছে ?'

সেই অনুক্ত ব্যঙ্গই গৌতমকে পাথর করে দিয়েছিল। গৌতম মাথা তোলেনি।

বুলবুলি পাখি অনেক অনুনয় বিনয় করেছিল, গৌতম নড়েনি।

তারপর দাদু তাঁর ভরাট দরাজ গলায় বললেন, 'গৌতম, তোমার দিদিমা এসে তোমায় এতো ডাকাডাকি করছেন, না গেলে ওঁকে

অপমান করা হবে। আমার ইচ্ছা তুমি ওঁর সঙ্গে যাও।'

তখন গৌতম নামের সেই পাথর হয়ে যাওয়া ছেলেটা চোখ তুলে চাইলো। দেখলো, দাদুর চোখে আর সেই ভয়-ধরানো ব্যঙ্গদৃষ্টিটা নেই, যেন কৌতুকের ঝিলিক রয়েছে।

'ওঠো! জামা জুতো পরে নাও।'

এরপর আর পাথর হয়ে থাকা সম্ভব নয়।

পিসি এসে হাত ধরে নিয়ে গেল জামা জুতো পরাতে।

গাড়িতে এসে চমকে গিয়েছিল গৌতম। গাড়িতে মা বসেছিল।

গৌতমকে নিয়ে দিদিমা উঠতেই বলে উঠলো, 'পাঠাতে রাজী হচ্ছিলেন না বোধহয়?'

বুলবুলি পাখি বলে উঠলো, 'উঃ, বুড়ো কী ঘুঘু! বাপ্‌স্‌!'

'আমার জানা আছে। তোমরা দেখো।' বলে মা গৌতমকে কাছে টেনে নিলো।

কিন্তু সেই নেওয়ার মধ্যে কি সে একটা আত্মসমর্পিত বালক-চিত্তকে পেয়েছিল? না, একটা অনমনীয় কাঠিন্যকে?

মায়ের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কাঠ হয়ে বসেছিল না সেই কাঠিন্য?

হাতটা ছুঁড়ে দিয়ে মা বলেছিল, 'চমৎকার! বেশ তৈরী করা হয়ে গিয়েছে! হবে নাই বা কেন! বাঁশ তো একই ঝাড়ের। ঠিক আছে।'

তবু সেটাই বেড়া ভাঙা।

তারপর মাঝে মাঝেই মামারা কোনো একটা ছুতোয়-নাতায় গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। দাদু কখনো গৌতমের পড়ার ছুতো করে গাড়ি ফেরত দিয়েছেন, কখনো বা বলেছেন, 'আচ্ছা যাও।'

স্কুলের পড়া বাদে ছুটির দিনে দাদুর কাছে সংস্কৃত পড়তে হতো। মামার বাড়ি যাবার আদেশ পেলে সেটা থেকে অব্যাহতি পাওয়া

যেতো। সেই অব্যাহতির আকর্ষণেই মামাদের গাড়ি এলে উৎফুল্ল হয়ে উঠতো গৌতম।

পিসির বোধহয় সেটা চোখ এড়াতো না।

পিসি গৌতমের জামা জুতো এগিয়ে দিতো, আর বলতো, 'বৃথাই তুমি খেটে মরছো বাবা! আমে দুধে ঠিকই মিশছে'।'

পিসির কথাগুলো ভালো লাগতো না গৌতমের। তবু সেই অসহায় বালকটার পিসিই তো ছিল আশ্রয়স্থল।

ছেলেটার তো একটা নিষ্পত্র বিরাট বৃক্ষের নীচে বাস। যাতে ছায়া নেই, স্নিগ্ধতা নেই।

পিসির কাছ থেকে সেটা অনেক সময়ই পাওয়া যেতো। দাদুর আড়ালে একথাও তো বলতে শুনেছে পিসিকে, 'বাবার যেমন! একটা কচি ছেলেকে বিদ্যাদিগ্‌গজ করে তুলবেন। বাপ নেই, মা তো থেকেও নেই, ওর প্রাণটার দিকে তাকাতে হবে তো? না কি বিদ্যে গিলিয়ে গিলিয়ে সেই তোতা কাহিনীর তোতার মতো অবস্থা ঘটাতে হবে ওর?'

ওইটুকু ছায়া। ওইটুকু স্নিগ্ধতা।

কিন্তু মা'র সম্পর্কে কথা হলেই পিসি অন্য মূর্তি। পিসির মধ্যে থেকে যেন-ঘৃণার বিষ উপচে ওঠে! যেন কোনো নরকের কীটের বিষয় কথা বলছে পিসি।

আশ্চর্য, তখন আক্রোশটা পিসির ওপর হয় না গৌতমের, হয় মায়ের ওপর—মা গৌতমকে এই পিসির সাহায্য নিতে বাধ্য করেছে বলে আর পিসি এই ঘৃণাটা প্রকাশ করবার স্কোপ্ পাচ্ছে বলে।

একথা যে অনায়াসেই বলতে পায় পিসি 'এবার পুজোয় তোর মা ভাইদের কাছে কী শাড়ি নিলো রে গৌতম? লাল বেনারসী?'

সেইটা বলতে পায় পিসি কার দোষে?

তা কেউ কারো বাড়ি না গেলেও হঠাৎ হঠাৎ দেখা-সাক্ষাৎ হয়ে যায় বৈকি। ঢাকুরিয়া আর ফার্ন রোডের মাঝখানে তো বিরাট

একটা ব্যবধান নেই। হটহট করে দোকানে বাজারে না গেলেও, পুজো মণ্ডপে তো যায় পিসি? রামকৃষ্ণ মিশনে ভাগবত কথা শুনতেও যায় পাড়ার গিন্নীদের সঙ্গে।

দাদু যান না।

এয়ার কন্ডিশন্‌ড্‌ ঘরে গদি আঁটা চেয়ারে বসে ভাগবত কথা শোনাকে দাদু ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে দেখেন।

পিসির সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে যে মা কথা কয় না তা নয়। পুরনো পাড়ার প্রতিবেশী-টেশীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে যেমন কথা কয় লোকে, সেই ভাবে কয়। পিসিও কথার ফাঁকে ফাঁকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নেয় মা নতুন কোন্‌ গহনা গড়িয়েছে, নতুন কোন্‌ ধাঁচের ব্লাউজ পরেছে। তারপর বাড়ি ফিরে বলে, 'চল্লিশ বছর বয়েস হলো, ছেলের বিয়ের বয়েস হতে চললো, এখনো এই প্রবৃত্তি! ছি ছি! সধবাতেও যে এ বয়সে এতো সাজে না।'

এই দাবদাহ থেকে টুনুর কাছে পালিয়ে আসে গৌতম।

কালো রোগা দাঁত-উঁচু সেই মেয়েটার কাছে যেন অনেকখানি ছায়া আছে, অনেকখানি শীতলতা আছে।

টুনুর বুদ্ধিটা এতো প্রখর, একটু কিছু বলে ফেললেই সব বুঝে ফেলে। মাকে, পিসিকে, দাদুকে, বুলবুলি পাখিকে, কাউকেই ও চক্ষে দেখেনি, তবু সবাইকে কী অদ্ভুত স্টাডি করে ফেলেছে! ওদের সম্পর্কে ক'টা কথাই বা বলেছি আমি ওর কাছে?

কথাটা ভাবে গৌতম আশ্চর্য হয়ে।

কারণ গৌতম জানে না এটা মেয়ে মাত্রেরই সহজাত ক্ষমতা। একটা কথা শুনলেই ওরা গোটা মানুষটাকে চিনে ফেলতে পারে। প্রখর বুদ্ধি না হলেও পারে।

আর টুনু হয়তো সত্যিই প্রখর বুদ্ধিশালিনী।

কিন্তু আজকে টুনু কী বিশ্রী রকমের বোকামী করে গেল।

দাদুদের দৃষ্টির কাছ থেকে সরে এসে ভাবলো গৌতম, কাল তোমায় আমি দেখাচ্ছি মজা। মানে হয় এই বোকামীর ?

মনে মনে টুনুকে বকতে বকতে কখন যেন টুনুর জন্যে ভয়ানক মন কেমন করতে শুরু করলো গৌতমের।

টুনু এই বাড়িতে এসেছিল। টুনু এই দরজা থেকে ফিরে গেছে !

কী দুঃখ !

সেই এলো, অথচ এমন দিনে এলো যে গৌতম নেই।

কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় গৌতম বাড়িতে থাকবেই বা কেন ? এটা তো টুনুর ভাবা উচিত ছিল।

আচ্ছা, টুনু কি ঠিক সন্ধ্যার সময়টাতেই এসেছিল ? না আরো পরে ? গৌতম তো আজ দীর্ঘ সময় বাড়িতে ছিল না।

দাদুর খবর পেশের ভাষাটা কী ছিল যেন !

'তুমি যখন ছিলে না, তখন একটি মেয়ে তোমার খোঁজ করতে এসেছিল।'

আমি তো অনেকক্ষণ বাড়ি ছিলাম না, গৌতম ভাবলো, আমি তো সে কথাটা বলতে পারতাম দাদুকে, ঠিক কখন ? কিন্তু বলতে পারলাম না।

টুনু ঠিকই বলে, 'তুমি আর মানুষ হয়েছো !'

কিন্তু টুনুকে কোথায় পেলো গৌতম ?

সে কথা বলা শক্ত।

বোধহয় ওদের দুজনের কারুরই 'প্রথম দেখার' ক্ষণটি মনে নেই। তবে এইটুকু মনে আছে গৌতমের, উত্তর কলকাতার মেয়ে টুনু শুধু গৌতমের জন্যেই যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে এসে এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছে।

গৌতম মাথায় হাত দিয়ে বললো, 'আমি তো আর দু'বছর পরেই

বেরিয়ে যাবো।'

'তাতে কি?' টুনু বলেছিল, 'দু-দুটো বছর কি কম নাকি? আর তেমন ইচ্ছে থাকলে, প্রেমের-পরীক্ষা দিতে আরও গোটা তিনেক বছর থেকে যেতেও পারো।'

'আরও কিছু নয়!' গৌতম মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'এই মতলব নিয়ে আমার পিছনে ধাওয়া করেছো?'

'তা তপস্বীর তপোভঙ্গ করাই তো উর্বশীদের ধর্ম।'

'উর্বশী! কী একখানা উর্বশী রে! দাঁড়কাক বললে কিছুটা কাছাকাছি আসে।'

'বলতে পারো যা ইচ্ছে।'

'তবু রেগে চলে যাবে না?'

'পাগল!'

'বাড়িতে কী বললো?'

'বাড়িতে? বাবা থেকে শুরু করে বাড়ির রান্না করার বামুনদি পর্যন্ত যা বললো, তার সারার্থ হচ্ছে, আমার উনপঞ্চাশটা বায়ুই প্রবল হয়ে উঠেছে। অতএব এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের বদলে আমার জন্যে মেণ্টাল হসপিটালে সিট্ জোগাড়ের চেষ্টা করাই উচিত।'

'তবু ছাড়লো তো?'

'এ যুগে কি আবার ও প্রশ্নটা আছে নাকি? না ছাড়লে বাড়ি ছাড়তাম।'

'অথচ কারণটা আমি।' গৌতম আর একবার মাথায় হাত দিয়েছিল, 'অবাক হয়ে যাচ্ছি।'

টুনু ওর কাছ ঘেঁষে বসে পড়ে খুব আলগা গলায় বলেছিল, 'কারণটা যে আসলে কী, হয়তো আমি নিজেও জানি না। কিন্তু ভেবে আনন্দে মরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে, সংগ্রাম-টংগ্রাম গোছের একটা কিছু করলাম আমি।'

'থাক্ মরতে হবে না। কিন্তু ক্লাশ তো এক নয়, রোজ দেখা হবে কি করে শুনি?'

'দেখা হবে না? তোমায় আমি খুন করবো।'

'লাভ হবে না তাতে। কিন্তু কি করে যে তুমি সিট্ পেলে তাই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি।'

'ঐকান্তিক ইচ্ছে থাকলে সবই পাওয়া যায়।'

'আহা! যায় বুঝি? আমার তো ঐকান্তিক ইচ্ছে লটারিতে একটা মোটা টাকা পাই।'

'লটারিতে টাকা! ছি ছি! এই তোমার ইচ্ছের দৌড়। ত্যাগের আদর্শে মানুষ হয়ে এই চরিত্র! শুনলে দাদু কী বলবেন?'

গৌতম হাসে। বলে, 'ওই তো, ওইটিই হচ্ছে মূল কথা। সব কিছুতেই দাদুর ভয়ে কাঁটা হওয়ার একমাত্র কারণ তো স্রেফ অর্থনৈতিক পরাধীনতা। কিছু টাকা পেলে হস্টেলে এসে থাকি।'

'এটা অকৃতজ্ঞতা।'

'হয়তো তাই। কিন্তু এটা অকপটতা।'

তারপর থেকে তো রোজই দেখা হচ্ছে। দুজনের ক্লাশ এক নয়, বিভাগ এক নয়। কিন্তু চেষ্টাটা এক। ফলে দেখাটা হয়েই যায়।

অনেকখানি হেঁটে হেঁটে চায়ের দোকানে গিয়ে দুজনে এক কাপ করে চা খেয়ে নেওয়া, অফ-পিরিয়ডে কোথাও বসে পড়া, সব চলছেই। এবং টুনুর সহপাঠিরা ধরেই নিয়েছে টুনু ফোর্থ ইয়ারের গৌতম চৌধুরীর সঙ্গে প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।

মাঝখানে দুটো দিন দেখা হয়নি।

হয়নি নেহাতই দৈবের কারণে।

তাই বলে টুনু এতই অস্থির হবে যে, বাড়িতে এসে হাজির হবে!

বুলবুলি পাখির মনের কথা বলার কোনো লোক ছিল না।

ছেলেরা ফিরেও তাকায় না, বৌরা গ্রাহ্য করে না। আর ছোট

মেয়েকে বুলবুলি পাখি ভয় করে। কোন্ কথায় যে ফোঁস করে উঠবে, সে বলা শক্ত।

অনেকদিন পরে বড়মেয়েকে পেয়ে বেঁচেছে বুলবুলি পাখি।

ছোট মেয়ে চোখের আড়াল হলেই বড়মেয়ের কাছে মনের কথা বলতে বসে সে, 'দেখছিস তো বিন্নু! দেখ্ ওর হালচাল। অথচ চল্লিশ বছর বয়েস হতে চললো।'

তার মানে গৌতমের পিসির সঙ্গে কোনো তফাত নেই বুলবুলি পাখির। শুধু গৌতমের পিসি বিভা দুঃখ হলে আঁচলে চোখ মোছে, আর বুলবুলি পাখি ফুলকাটা রুমালে।

বিন্নুকেও এখন আর বিশেষ পালিশ করা দেখাচ্ছে না। বরাবরই ঢিলেঢালা স্বভাব বিন্নুর। সাজগোজ করে, কিন্তু খানিক পরেই দেখা যায় সব সাজ কেমন গুব্লেট হয়ে গেছে।

সেই আলুথালু বিন্নু খাটে গা গড়িয়ে বলে, 'সাজে সাজুক গে, মরুক গে, কিন্তু কথা হচ্ছে ওই লোকটা কেন রোজ সন্ধ্যেবেলা এসে আড্ডা মারে? এটা তুমি কী করে অ্যালাউ করো মা?'

'আমি অ্যালাউ করি?' বুলবুলি পাখি শিরে করাঘাত করে, 'আমার কথায় চলছে সংসার?'

'চলা তো উচিত। তুমি হেড্।'

'রেখে দে বিন্নু উচিতের কথা। সংসারে এখন হেড্ টেল্-এ তফাত নেই। ওই মজুমদারটা হচ্ছে ববির বন্ধু, শুনতে পাই নাকি ওর বিজনেসের পার্টনার, ওকে দূরছাই করা চলবে না।'

'দূরছাই! দূরছাইয়ের কথা হচ্ছে না, তবে ববির বন্ধুকে ববিই নিয়ে বসুক না, সুমি কেন? সুমির কী দরকার সারা সন্ধ্যে ওকে নিয়ে উছলে উছলে গল্প করবার?'

'কী দরকার!' বুলবুলি পাখি নিশ্বাস ফেলে বলে, 'কী দরকার সে তুমিও বুঝছো, আমিও বুঝছি, মুখে প্রকাশ করলেই নীচতা। আমার শুধু ভয় কতোদূর গড়ায়।'

বিন্নু দীর্ঘদিন আগের কথা তোলে।

বিনু বলে, 'ছেলের কাছ ছাড়া করে রাখাটা ঠিক হয়নি। ছেলে কাছে থাকলে একটু রাশটানা থাকতো।'

'বুড়ো কি পাঠালো ছেলেকে? আমরা আব কী করবো? সুমিকে তো বলতে পারিনে তবে তুমি চলে যাও।'

'না, সে কী আর বলা যায়!' বিনু বলে, 'তবে জল অনেকদূর গড়িয়েছে। ছেলে তো মাকে আপন বলে ভাবেই না। বরং যেন অগ্রাহ্যর ভাব।'

'আপন ও ছেলে কাউকেই ভাবে না।' বুলবুলি পাখি আব একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'আমি তো চেষ্টা কবলাম। ঘবেব নাতিদেব লুকিয়ে ভালো মন্দ দিতে চেষ্টা করেছি, কোনো ফল হয়নি। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। দেখলি তো সেদিন? অতো বাত পর্যন্ত রইলো, অতো সাধলাম, খেয়ে গেল না। কী, না দাদু বসে থাকবেন।'

'শাসনে শাসনে ওই রকম হয়ে গেছে বেচাবী। আহা, বাজার কতো আদরের ছেলে!'

বুলবুলি পাখি এখনো অভিযোগেব বালিব মধ্যেই পাক খাচ্ছিল, ~~বলে~~ উঠলো, 'বললে বিশ্বাস করবি, হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ কবায় একটা রিস্টওয়াচ কিনেছিলাম ওব জন্যে, নিলো না!'

'নিলো না?'

'না! বললো কি, 'দাদু এখন থেকে এসব বিলাসিতা পছন্দ করেন না।' অথচ দাদু যে পৈতের সময় মুক্তো বসানো আংটি গড়িয়ে দিয়েছিলেন, তা তো বেশ পরে আছেন বাবু। আবার বলে কিনা, দাদু বলেছেন শরীবে মুক্তোধারণ করলে, দুঃখকষ্ট থেকে মুক্ত হওয়া যায়।'

'আ ছি ছি! এতো কুসংস্কার?'

'এইটুকুতেই চমকাচ্ছিস? সব শুনলে তো ফেণ্ট্ হয়ে যাবি। সেই পৈতে হওয়া থেকে তিনসন্ধ্যে গায়ত্রী জপ করতে হয় বাছাকে।'

'চমৎকার! সুমি কিছু বলে না?'

'সুমির বলবার কি আছে? বুড়ো যে মন্ত্রপূত করে রেখেছে। নইলে এমন করে কখনো ছেলেপুলে?'

অতঃপর দুটি বিজ্ঞ মাথা আলোচনা করতে থাকে কেমন করে সুমিতাকে সন্ধ্যার নেশা ছাড়ানো যায়।

'ছেলেটা যদি রোজ বিকালে এসে মা'র কাছে বসে থাকে রাত অবধি—'

'যদি! হুঁঃ! যদির কথা নদীতে থাক। কথা হচ্ছে, মাকে আর কি উপায়ে ঠেকানো যায়, সেই পরামর্শ করা।'

কিন্তু ঠেকাবো বললেই কি ঠেকানো যায়? উপছে ওঠা নদীকে ঠেকানো যায়? সর্বনাশা কুলপ্লাবিনী বন্যাকে?

সাতাশ বছর বয়েস থেকে সুমিতা শূন্যতার হাহাকার নিয়ে বসে আছে। অথবা সাতাশও নয়, সতরো থেকেই।

রাজা তাকে 'মহারাণী' বলে ডেকেইছে শুধু, রাজ ঐশ্বর্যে তার শূন্যতাকে ভরে তুলতে পারেনি। রাজা ছিল অনেকের মানুষ, কেবল মাত্র একজনের নয়।

অথচ সুমিতা শুধু তাই চেয়েছে। সুমিতা বোধহয় সন্তানকেও ভালবাসার ভাগীদার বলে হিংসে করেছে।

তাছাড়া রাজার মধ্যে উল্লাস ছিল, উন্মত্ততা ছিল না; আবেগ ছিল, উগ্রতা ছিল না; ভালবাসার প্রাবল্য ছিল, বাসনার জটিলতা ছিল না। অথচ সুমিতার মধ্যে প্রবল চাহিদা ছিল ওই 'না থাকা'-গুলোর জন্যেই।

রাজা চাইতো মানুষ, সুমিতা চাইতো সোসাইটি। রাজা ফুটতে চাইতো ফুলের মতো, সুমিতা ফুটতে চাইতো কাঁটার মতো।

রাজা ভাবতো 'অনেক পেয়েছি।'

সুমিতা ভাবতো 'কিছুই পাইনি।'

এই দুই বিপরীত শক্তি নিজেকে কেবল নিজের মধ্যে সংহত

বাখতে রাখতে ক্ষয় হয়েছে।

সুমিতা হয়তো তেমন করে সংহত রাখেনি, হয়তো ফেটে পড়েছে যখন তখন, কিন্তু রাজা সংহত রেখেছিল। রাজা সেই একবারই শুধু ফেটে পড়লো। উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল

কিংবা উদ্‌ঘাটিত হলো না। বন্দুক সাফ করতে করতে গুলি ছুটে মারা গেলে আর উদ্‌ঘাটিত হবার কী আছে?

রাজা নামেব লোকটা যে ঢিলেঢালা আর অসাবধান ছিল, সেই কথাটাই শুধু প্রকাশ পেলো।

এমন কি দেবেন্দ্রনারায়ণ নামের বৃদ্ধ লোকটি পর্যন্ত বাজে পোড়া তালগাছের মতো সোজা দাঁড়িয়ে নিষ্কম্প গলায় বলে উঠেছিলেন, 'এরকম একটা কিছু হতেই হবে। জানতাম! ধর্মের বংশে পাপের স্পর্শের প্রতিক্রিয়া!...বহু জীবহত্যার শাস্তি! মৃত্যুপথযাত্রী নিরীহ প্রাণীদের অভিশাপের ফল!'

রাজা যে শীকাব করতো, এটা দেবেন্দ্রনারায়ণ অনুমোদন করতেন না, কিন্তু বয়স্ক ছেলেকে নিষেধ করবার গ্রাম্যতা ছিল না তাঁর।...তাছাড়া যৌবনে তো তিনি 'সাহেব' ছিলেন।

আশ্চর্য, বুড়ো হয়েও লোকটার গলা কাঁপে না। এখনো নিষ্কম্প গলায় বলে, 'রক্তের ঋণ অমোঘ! ওর ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি।'

জাঁতি দিয়ে হর্তুকি কুচিয়ে একটা ছোট পাথর বাটিতে করে বাপের হাতে তুলে দিয়ে বিভা আক্ষেপের গলায় বলে, 'আপনার হাতে মানুষ হয়েও যে—'

'যে'টা যে কি সেটা আর বললো না।

তারপর আস্তে বললো, 'মেয়েমানুষ হয়ে এঞ্জিনীয়ার হতে চায়, সেই মেয়েকে পছন্দ হলো গৌতমের!'

যেন এর থেকে অধঃপতন আর হতে পারে না। যেন গৌতম নরকের টিকিট কিনেই ফেলেছে।

অথচ কারণটা আর কিছুই নয়, একটি মেয়ে গৌতমকে খুঁজতে এসেছিল, আর বলেছিল, 'বলবেন টুনু এসেছিল, বুঝতে পারবে।'

তাই এঁরা বুঝতে পেরেছেন।

তা হয়তো বুঝতে পারা যায়। (ভালোবাসার চোখে যে আলো জ্বলে, সেই আলোই ধরা পড়িয়ে দেয়। বলে দেয়, গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গেছে ওদের মধ্যে।)

কিন্তু ছি ছি! কী লজ্জা! কী লজ্জা!

ক্ষোভে ধিক্কারে বিদীর্ণ হতে থাকেন দেবেন্দ্রনারায়ণ।—

মাত্র কুড়ি বছর বয়েস গৌতমের।

অথচ সেই সাত বছর বয়েস থেকে আমি ওকে পবিত্রতার শিক্ষা দিচ্ছি, ত্যাগবাদের শিক্ষা দিচ্ছি, আর বলিষ্ঠ চরিত্র এক ব্রহ্মচারীর মূর্তির স্বপ্ন দেখছি। প্রাচীন ভারতের জ্ঞানের দীক্ষা আর আধুনিক পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের শিক্ষা, এই দুইয়ের সমন্বয়ে গঠিত একটি নতুন সৃষ্টি দেখাতে চেয়েছিলাম সমাজকে।...তাই আমি ওকে ব্রাহ্মণসন্তানের সর্ববিধ আচার পালন করিয়েছি, ওকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছি, হোমের আগুনের মতো পবিত্র শিখায় জ্বালাতে চেয়েছি।

কিন্তু ও?

ও প্রতি পদে আমাকে চিন্তিত করেছে ওর প্রবণতার চেহারা প্রকাশিত করে। ও ওর সেই অশুচিচিত্ত মাকে বর্জন করবার দৃঢ়তা সংগ্রহ করতে পারেনি, বার বার তার কাছে যায়।

সেই একদিন বাঁধ ভেঙে দিয়ে আমি ভুল করেছিলাম! ওকে একেবারে মা'র কথা ভুলিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব করে নিতে পারলেই ভালো ছিল। অনেক যত্নে আমি শিব গড়বার মাটি ছানলাম, কিন্তু লক্ষ্য করলাম না কাঁকর রয়ে গেছে ওর মধ্যে।

তবু এতোটা আশঙ্কা করিনি। ছি ছি!

কুড়ি বছর পূর্ণ না হতেই ও একটা কুশ্রী কুরূপা, হয়তো বা ওর

থেকে বয়সে বড়ই, মেয়ের প্রেমাসক্ত হলো।…

এ যেন দেবেন্দ্রনারায়ণের সমস্ত পরিকল্পনাকে এক নির্লজ্জ ব্যঙ্গের ফুৎকারে ধূলিসাৎ করে দেওয়া।

আমি সেই পাজী মেয়েটার কাছে হেরে গেলাম! ভাবলেন দেবেন্দ্রনারায়ণ, যে লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটা বৈধব্যের শুভ্রতাকে পায়ে মাড়িয়ে রঙিন হয়ে বসে আছে।

সে আমার পরাজয়ে উল্লাসেব হাসি হাসবে। আমার দিকে আঙুল তুলে বলবে, 'কি হলো? মায়ের কাছ থেকে ছেলে ছিনিয়ে রেখে, খুব উচ্চ আদর্শে মানুষ করছিলে না? একটা ভালো জামা জুতো পরতে দাওনি তাকে ছেলেবেলায়। শুনতে পাই বড় হবাব পরও তাকে নাটক নভেল পড়তে দাওনি, সিনেমা কাকে বলে জানতে দাওনি, একটা বিয়ে বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে যেতে দাওনি।

অর্থাৎ তাকে তুচ্ছ জৈবিক বাসনার প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে চেয়েছিলে। যেটা ছিল আমার প্রতি চ্যালেঞ্জের মতো।

কিন্তু এখন দেখলে তো?

কৈশোর না যেতেই সে নারী-প্রেমের স্বাদ পেতে গেল।

বলো এখন জিত হলো কার?

আমি কি বলিনি, বজ্র আঁটুনিতেই গেরো ফস্কায়। ইচ্ছে বাসনা লোভ শখ, এগুলো মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, ওকে জোর করে চাপা দিতে গেলে—সেটা বিকৃতই হয়ে ওঠে। স্কুলের সব ছেলে রোজ পয়সা নিয়ে যায়, ও বেচারী একটা দিনও নিয়ে যেতে পারে না? ওর দুঃখ হয় না? ওর অভিযোগ জমে না?

হ্যাঁ, সেই একদিন ছেলের হাতে পয়সা দেওয়ার জন্যে রাজার বৌ মহারাণীকে তিরস্কার কবেছিলেন রাজপুত্রের জ্ঞানবৃদ্ধ পিতামহ।

বলেছিলেন, 'আক্ষেপ আর অভিযোগ—এর কখনো শেষ নেই বৌমা! 'পাওয়া' জিনিসটা কুম্ভকর্ণের মতো। যতো পাবে, পাওয়ার বাসনা ততোই বেড়ে যাবে। আর বাড়তে থাকবে অসন্তোষ। অনেক পেলে, সামান্য না পাওয়াটাই মস্ত বড় হয়ে দেখা দেয়।

ওকে আমি 'মানুষ' করতে চাই বৌমা! আদর দিয়ে তুমি ওকে 'বাঁদর' করে তুলো না।'

সেই দুর্মতি মেয়েটা বলেছিল, 'ও তো আমারও ছেলে, ওর ওপর আমার কোনো অধিকার নেই?'

তার জ্ঞানবৃদ্ধ শ্বশুর রূঢ় গলায় বলেছিলেন, 'নষ্ট করবার অধিকার নেই। মনে রেখো, এই চৌধুরী বংশের একমাত্র বংশধর ও। দ্বিতীয় আর একজনকে দেবার ক্ষমতা এখন আর স্বয়ং ভগবানেরও নেই।··· ওকে গৃহবিগ্রহের মতো সাবধানে রাখতে হবে।'

সে বলেছিল, 'বেশ, তবে করুন ওকে মানুষ। বংশের উপযুক্ত করে। নিষ্ঠুর নিয়মে। আমায় ছেড়ে দিন।'

এখন সে বলবে বৈকি, 'হয়েছে তো বংশের উপযুক্ত? কুড়ি বছরে প্রেম করতে, বোধহয় আমার হাতে থাকলেও শিখে উঠতে পারতো না।'

অদৃশ্য এক প্রগল্‌ভা প্রতিপক্ষকে সামনে দাঁড় করিয়ে নিজেই তার হাতে ব্যঙ্গের ছুরিটা তুলে দিয়ে জর্জরিত হতে থাকেন দেবেন্দ্রনারায়ণ।

বিভা সরে আসে। বিভা এ সময় কথা বলতে পারে না।

বিভা বাবাকে যমের মতো ভয় করে।

ভয় আর দাসত্ব, এই আছে বিভার মধ্যে, আর সব বৃত্তিগুলো বোধহয় বিনা আহারে মরে গেছে। অথচ বিভার থেকে বয়সে বড়, মান্যেও বড় আর এক মহিলা ঠিক সেই মুহূর্তেই সোফায় গা ডুবিয়ে বসে আবেগে মদির কণ্ঠে সামনে বসে থাকা প্রায় প্রৌঢ় বিহ্বল পুরুষটির দিকে তাকিয়ে বলছিল, 'হৃদয়বৃত্তি কখনো মরে যায় না মজুমদার! শুধু অনশনে অনটনে নির্জীব হয়ে পড়ে থাকে। তোমার কি মনে হচ্ছে তোমার মধ্যে আর কিছু নেই? ফুরিয়ে গেছ তুমি?'

মজুমদার বয়সে প্রায় প্রৌঢ় হলেও তরুণের ভূমিকায় উতরে যান।

যারা সত্যি তরুণ তারা হয়তো অতোটা পেরে ওঠে না। অতোটা বিহ্বল কটাক্ষ, অতোটা ভালবাসাবাসির কথা ওদের হাস্যকর রকমের নাটকীয় লাগে। ওদের প্রকাশভঙ্গী আলাদা।

ওরা আবেগের সিন্দুকে চাবি লাগিয়ে চড়া গলায় বলে, 'আমার আজকের প্রথম কাজ হচ্ছে তোমাকে ফাঁসি দেওয়া।'

যে শোনে সেও তেমনি সুরে বলে, 'সেটা এখনো বাকি আছে নাকি? ঝুলেই তো আছি ফাঁসিকাঠে। তা নইলে আর মরতে মরতে তোমার দাদুর সামনে গিয়ে দাঁড়াই?'

'কেন? কেন? সেইটি যাওয়া হয়েছিল কেন? দুদিনের অদর্শনে মারা যাচ্ছিলে?'

'মারা যেতে যাবো কোন্ দুঃখে। ভাবলাম হয়তো বিছানায় পড়ে কাতরাচ্ছ। যাই একবার বন্ধুকৃত্য করে আসি।'

'অপূর্ব! দাদুকে বুঝি জানো না?'

'জানতাম বলে গর্ব ছিল, সে গর্ব ধূলিসাৎ। দেখে বুঝলাম, কল্পনা ধারে-কাছে লাগে না। উঃ, কী সাংঘাতিক রাশভারী! শুধু মাত্র জিজ্ঞেস করেছেন 'গৌতম এলে কী বলবো?' তাতেই হৃৎকম্প। উঃ, রাতদিন তোমার ওঁর সঙ্গে থাকতে ভয় করে না?'

'করে। মানে করতো। কিন্তু ঠিক করেছি আর ভয় করবো না। অকারণ ভয় করার কোনো মানে হয় না।'

'অকারণ? অকারণ কোথা? রীতিমত সকারণ। দেখলেই তো ভয় করে। আচ্ছা, উনি কী সত্যিই কখনো জামা গায়ে দেন না?'

'না!'

'শীতকালে?'

'উঁহু। শুধু গরম চাদর।'

'আর যখন চাকরী-টাকরী কাজকর্ম করতেন?'

'তখন? তখন তো শুনতে পাই ঘোরতর সাহেব ছিলেন। ভোগবিলাসে ত্রুটি ছিল না।'

'ধ্যেৎ! তাই আবার হয় নাকি?'

'জগতে কী না হয়? মানুষের মতো পরিবর্তনশীল আর কী আছে?'

'তুমি জিগ্যেস করো না কিছু?'

'কী দরকার? বৃদ্ধমহোদয়কে ঘাঁটাতে যাই না। শুনতে পাই স্ত্রী-বিয়োগের পরই হঠাৎ ভদ্রলোকের হৃদয়ে এক বিরাট পরিবর্তন আসে, তারপর মেয়ের বৈধব্য জীবন একেবারে রূপান্তর ঘটায়।'

'তাই নাকি, তাহলে তো বলতেই হয় ভদ্রলোক রীতিমত হৃদয়বান।'

'হতে পারে। তবে সে হৃদয়টি ঝুনো নারকেলের ভিতরকার জলের মতো, চট করে ব্যবহারে আসে না। আমার ভাগ্যে ওই ঝুনো খোসাটাই জুটেছে।'

'তোমার ঠাকুমা বুঝি খুব সুন্দরী ছিলেন?'

'জানি না। দেখিনি। তাঁর জীবদ্দশায় কোনো ফটো তুলে রাখবার খেয়াল কারো হয়নি। পিসির মুখে শুনেছি সারাদিন শুধু ঠাকুর ঘরেই পড়ে থাকতেন। গুরু-টুরু ছিল। রান্নাঘরও আলাদা ছিল মহিলার। এদিকে দাদু তখন দোর্দণ্ডপ্রতাপ সাহেব, ব্রিটিশ সরকারের প্রিয় অফিসার। বাবুর্চির রান্না ছাড়া মুখে রোচে না, ছেলেমেয়েকেও নিজের দলে টেনে রেখেছেন তাদের শুচিবায়ুগ্রস্ত মায়ের কাছ থেকে। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল কেবল তাঁর ওই ঠাকুর-দেবতা গুরু-টুরু নিয়ে ব্যঙ্গ করা, তাঁর বার-ব্রত উপোস-টুপোস নিয়ে রাগ করা। অন্য সব অফিসারের স্ত্রীরা বাইরে-টাইরে বেরোতো, উনি সে সুখ থেকে বঞ্চিত ছিলেন, তাই রাগ ছিল।...তবে মনে হয় সুন্দরীই ছিলেন, না হলে বাইরে বার করবার ইচ্ছে হতো না। সুন্দরী স্ত্রী পাশে নিয়ে বেরোলে তবেই না সুখ!'

'চমৎকার!' টুনু ঝঙ্কার দিয়ে বলে, 'আমার বর তাহলে আমাকে পাশে নিয়ে বেরিয়ে সুখ পাবে না?'

'তোমার বর? সে হতভাগা কি তার ভাঙা কপাল নিয়ে জন্মেছে পৃথিবীতে? এতো বড়ো দুর্ভাগা কি জন্মায়?'

টুনু একটা ভ্রূভঙ্গী করে বলে, 'এই বয়সে খুব কথা শিখেছো তো? এদিকে মানুষ তো হয়েছো ওই ঝুনো নারকেলের কাছে।'

'আব পিসির কাছে হইনি?' গৌতম হেসে উঠে বলে, 'তিনি যে কথার সম্রাট!'

'হুঁ। একদিনেই বুঝেছি। কী জেরা! কী জেরা! বাপ্‌স্‌!'

'খুব জেরা করেছিল?'

'হুঁ।'

'কী বললো?'

'এখন অতো মনে নেই। বোধ হয় তোমার সঙ্গে কী সূত্রে আলাপ, কতোদিনের আলাপ, এই সব।'

'সূত্র? আচ্ছা সত্যি সূত্রটা কী বলো তো?'

'মনে নেই। বোধ হয় বাসে লেডিস সীট্ নিয়ে ঝগড়া।'

'হুঁ। তাই, মনে পড়েছে।'

'কিন্তু এই ভেবে অবাক হচ্ছি, এতো ছটফটে এতো বাক্যবাগীশ, এতো ইয়ার তুমি হলে কী করে? তোমার যা পরিবেশ আর যা শিক্ষাদীক্ষার পদ্ধতি, তাতে তো ল্যাবাভ্যাবা একটি সুবোধ বালক হবার কথা তোমার।'

'হয়তো এটাই প্রতিক্রিয়া।' গৌতম হাসে, 'স্কুলে থাকতে মনে হতো, কলেজে একবার উঠতে পারলে হয়। যেদিন উঠবো, সেইদিনই রেস্টুরেন্টে খাবো, আর সিনেমায় যাবো।'

'বাঃ! বাঃ! শুনে এতো আহ্লাদ হলো! তা রেখেছিলে প্রতিজ্ঞা?'

'তা অবশ্য নয়। ইচ্ছেই হয়েছে, কিন্তু ঠিক প্রেরণা পাইনি। গোল্লায় গেলাম তোমার সঙ্গে মিশে।'

'আমার পক্ষে এটা একটা ভালো সার্টিফিকেট।' টুনু বলে ওঠে, 'অন্তত একটা অতি সুবোধ গোপাল বালককে গোল্লায় যাওয়াবার

ক্ষমতা ধরি। কিন্তু তোমার ওই পিসির কথা জানতে ইচ্ছে করছে। তিনিও তো সাহেব বাবার এলাকায় মানুষ, তবে ওরকম কণ্ঠি-ফণ্ঠী পরা বৈষ্ণবী প্যাটার্নের হলেন কী করে বলো তো?'

'ওই তো বললাম, স্ত্রী-বিয়োগের পরই হঠাৎ ভদ্রলোক সমস্ত সাহেবীয়ানা ত্যাগ করলেন, টাইমের আগেই রিটায়ার করলেন, এবং স্ত্রীর সেই গুরুকে খুঁজে বার করে তাঁর কাছে দীক্ষা নিলেন।'

'সর্বনাশ! বলো কি! এতো প্রেম! সাজাহানকেও হার মানাচ্ছে যে!'

'প্রেম কিংবা অনুতাপ!'

'আরে বাবা, প্রেম না থাকলে কি আর অনুতাপ আসে?'

'আসে না তা বলা যায় না। চিতায় মঠ দেওয়ার নজীরও তো আছে···মোটকথা, ছেলেটি তখন প্রায় তৈরী হয়ে গিয়েছিল, ওই মেয়েটিই হলো দাদুর অনুতাপ যজ্ঞের বলি! ওকে দশবছর বয়সে ফ্রক ছাড়িয়ে শাড়ি ধরানো হলো, স্কুল ছাড়িয়ে শিবপুজো ধরানো হলো, এবং দাদুর স্বপাক হবিষ্যির খিদমদগারির চাকরীটা দেওয়া হলো। তারপর পনেরো ষোলো হতে না হতেই একটি পবিত্র বৈষ্ণবকুলতিলকের হাতে সম্প্রদান। আর তারও পর? ভাগ্য বিড়ম্বনায় কন্যার অবিলম্বে বৈধব্য।···ব্যস, অতঃপর তার গলার নেকলেস খুলে নিয়ে গলায় তুলসীর মালা তুলে দেওয়া।···কর্মজীবন ত্যাগ করে পৈতৃক এই বাড়িটায় ফিরে এসে বিধবা কন্যার সঙ্গে আদর্শ বাপের মতো ব্রাহ্মণোচিত জীবন যাপন করা। চলছিল মন্দ নয়। গণ্ডগোল ঘটালেন আমার বাবা।'

বলেই চুপ করে যায় গৌতম।

টুনুও একটু চুপ করে থাকে।

টুনু জানে, বাবার কথা উঠলেই থেমে যায় গৌতম, আর গল্প করতে পারে না।

তবু টুনু এতোদিনে জেনে ফেলেছে, ছেলে মারা যাবার পর দেবেন্দ্রনারায়ণ পিতৃহীন পৌত্র ও বিধবা পুত্রবধূকে নিয়ে এসে কী

পরিমাণ সনাতন আদর্শের ছাঁচে ভরে ফেলতে চেয়েছিলেন।... পুত্রবধূ তো খাঁচা খুলে উড়ে গেছে। নাতিটা পারেনি। সে একটা অদ্ভুত জগতের মধ্যে মানুষ হয়েছে।

সে দাহুর প্রাবল্যে বশ্যতা স্বীকার করে চলতে বাধ্য হয়েছে বটে, কিন্তু বিদ্রোহের সুর তার রক্তে বেজেছে।

দাহুকে সে অশ্রদ্ধা করতে পারে না, কিন্তু সর্বদা মনে হয় কোথায় যেন একটা বিরাট ভুল আছে ওঁর। যেন কোথায় আছে একটা বড় ফাঁকি, যেটা ঢাকবার জন্যে প্রাণপণ সাধনা করে চলেছেন।

'মনে হয় কী জানো? পিসির আবার বিয়ে দিতে পারলেই যেন উনি বাঁচতেন।'

'ধ্যেৎ! ওঁর প্রকৃতিতে ওটা কী করে খাপ খাবে?'

'জানি না খাপ খায় কিনা, আর আমার মনে হওয়াটাই নির্ভুল কি না, তবু মনে হয়। নিজেকে নিজে এমন এক অদ্ভুত শৃঙ্খলে বেঁধে বসে আছেন তার থেকে ওঁর মুক্তি নেই। ওঁর সেই গুরু ওঁকে মুঠোয় চেপে বসে আছেন।...পিসির বঞ্চিত জীবন ওঁকে জগতের সকলের ওপর আক্রোশপরায়ণ করে তুলেছে, অথচ উনি ভাবছেন, প্রাচীন ভারতের ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করেছি বলেই আমার বিলাসিতা দেখলে রক্তে আগুন ধরে যায়। তা ছাড়া, আমার মা'র ব্যবহারও হয়তো এই বিকৃতির জন্যে কিছুটা দায়ী।'

বলেই আবার চুপ করে যায় গৌতম।

টুনু আস্তে ওর হাতের ওপর একটা হাত রাখে। তারপর বলে, 'ছেলেবেলায় তুমি যদি জোর করে কেঁদেকেটে তোমার মায়ের সঙ্গে চলে যেতে ভালো হতো।...আচ্ছা, এতো কঠোর শাসনের মধ্যে থাকতে হয়েছে তোমায়, তবু চলে যাওনি কেন?'

'জানি না।' গৌতম বলে, 'হয়তো আমার মধ্যে প্রবাহিত আমার পিতৃপিতামহের রক্তই আমাকেও উল্টোপাল্টা করেছে। আমার বাবাও তো—না টুনু, মামার বাড়িতে যাবার কথা আ

ভাবতেই পারতাম না। এখনও পারি না। দাদুর বাড়ির কঠোরতাও যেমন বিদ্রোহী করে তোলে আমায়, দিদিমার বাড়ির ওই শিথিলতাও তেমনি বিদ্রোহী করে তোলে।...আমি নিজের সম্পর্কে এতো বেপরোয়া চিন্তা করি, কিন্তু যখন আমার বুড়ি দিদিমা—'

'বুলবুলি পাখি বলো?'

বলে হেসে ওঠে টুনু।

গৌতম হাসে না। কেমন একটা কঠিন মুখে বলে, 'যখন দেখি সেই বুলবুলি পাখি বাড়ির ঝি-চাকরের রান্নাকরা মুরগীর ঠ্যাং ঠোকরাচ্ছে, আমার সমস্ত চেতনা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।'

টুনু বলে, 'এটা তোমার ওই দাদুর শিক্ষার ফল আর কি। নইলে দেখো, মানুষ তো? তার খাবার, পরবার, বেড়াবার সব ইচ্ছে আর একজনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে? তোমার দাদুর কথা বাদে, পুরুষরা তো বৌ মরে গেলে কিছু ত্যাগ করে না? বরং—'

টুনু চোখটা একটু কৌতুকে নাচিয়ে বলে, 'সে রকম একটি নমুনা আমার দৃশ্যগোচরে রয়েছে কি না।'

গৌতম ওর ওই শেষ কথাটায় কান দেয় না, পুরোনো কথাটার জের ধরেই বলে, 'বুদ্ধি দিয়ে তোমার যুক্তি অগ্রাহ্য করতে পারি না টুনু, কিন্তু অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে উঠলে উপায় কি? কিন্তু কিসের যেন নমুনা বলছিলে?'

টুনু হেসে উঠে বলে, 'বিপত্নীকের নমুনা। ও কিছু না, একটা বাজে কথা।...কিন্তু আমি তোমার বাড়ি গেলাম। এবার তুমি আমার বাড়ি এসো।'

'কেন, বাড়ি গিয়ে কী হবে?' গৌতম হাসে, 'এটা কী মন্দ?'

'মন্দ নয়! কিন্তু সব সময় বুঝি এই রকম রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ভালবাসতে ইচ্ছে করে? মনে হয় আমাদের যেন স্থিত নেই ভিত নেই, সমাজ নেই, সংসার নেই, অতএব ভরসা নেই, ভবিষ্যৎ নেই। এই রকম পথে ঘুরতে ঘুরতে কোনদিন কে কোন্ পথে ভেসে

যাবো।'

গৌতম হেসে উঠে বলে, 'এব মধ্যেই এতো সব ভাবনা চিন্তা এসে গেছে তোমার? আশা নেই, ভবিষ্যৎ নেই, স্থিত নেই ভিত নেই। কতো বয়েস হলো?'

টুন্নু হাসে না। বলে, 'তোমার থেকে কম নয়। কিন্তু কি জানো গৌতম, মা নেই বলেই হয়তো আমাব মধ্যে এমন 'কিছু নেই, কিছু নেই' ভাব। মা না থাকা, যেন সব কিছুই না থাকা।'

টুন্নুর মা নেই, সে কথা জানে গৌতম।

আর ওই না থাকাটা যে খুব দীর্ঘকালের নয়, তাও জানে। টুন্নু যখন হায়ার সেকেণ্ডারীর জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, তখন ওর মা মারা গেলেন।

টুন্নু বলেছিল, 'মা অনেকদিন থেকেই ভুগছিল, মা বিশেষ কিছুই করতে পারতো না। শেষেব ক'মাস তো বিছানাই নিয়েছিল, তবু কোথাও কোনো শূন্যতা বোধ ছিল না। মা মারা যাওয়ার পর ঠিক কি মনে হলো জানো? যেন আমি দিব্যি একটা দোলনায় বসে দোল খাচ্ছিলাম, হঠাৎ দোলনার দড়িটা ছিঁড়ে পড়ে গেলাম।'

গৌতমের মা আছেন। তাই হয়তো এসব কথা বলতে পেরেছিল টুন্নু। গৌতমের যে 'আমার মা আছেন—' ভাবতে গেলেই হঠাৎ প্রকাণ্ড একটা গহ্বরে পা বসে যায়, সে কথা তো জানে না টুন্নু।

টুন্নু জানে, দাদুর শাসনের দাপটে মায়ের কাছে থাকতে পায় না গৌতম। অথবা গৌতমের কাছে মা।

'তোমার বাবা নেই, আমার মা নেই—' বলেছিল একদিন টুন্নু, 'অবস্থায় একটা বিশেষ সাদৃশ্য আছে।'

কিন্তু 'বাবা নেই' এই খবরটুকু ছাড়া আর কোনো কথাই বলেনি গৌতম, তার অন্তরঙ্গ বান্ধবীকেও।

বাবার কথা ভাবতে গেলেই যে সেই ভয়ানক কষ্টটা হয় গৌতমের।

আর গৌতমের সমস্ত চৈতন্যকে প্রবল ধাক্কা দিয়ে সেই শব্দটা

সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হয়ে যায়।

একটু আগেই দেখে গিয়েছিল গৌতম, বাড়ির পিছন দিকের বারান্দায় বসে বন্দুক সাফ করছেন বাবা।

গৌতমকে দেখে বন্দুকটা পাশে নামিয়ে রেখে ডেকেছিলেন।

গৌতম তখন একটা কুকুরছানার গলায় বগলস পরাবার জন্যে অস্থির, ব্যস্ত ভঙ্গীতে এসে দাঁড়িয়েছিল, 'কী বলছো ?'

বাবা বলেছিলেন, 'নাঃ, কিছু বলছি না। যাও খেলা করগে।'

গৌতম চলে গিয়েছিল।

তার কতোক্ষণ পরে যেন সেই শব্দটা। তার সঙ্গে তীব্র একটা গন্ধ।

গৌতমকে কারা যেন সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল জোর করে ধরে, তবু গৌতম দেখে ফেলেছিল ঘরের মেঝেয় শুয়ে পড়ে আছেন বাবা, রক্ত গড়াচ্ছে মেঝেয়। বন্দুকটা শুয়ে আছে বাবার কাছে।

অসাবধানে বন্দুকের গুলি ছুটে মারা গিয়েছিলেন বাবা।

কিন্তু বারান্দা থেকে কখন ঘরে ঢুকে গিয়েছিলেন বাবা, আর কেনই বা গিয়েছিলেন তা কোনোদিন বুঝতে পারলো না গৌতম।

'তোমার একুশ বছর বয়েস হতে আর কতো বছর আছে ?' টুনু হঠাৎ ওকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়, 'এক্ষুনি বিয়ে করে ফেলবার ভীষণ ইচ্ছে করছে আমার। বিয়ে-টিয়ে করে অনেক দূর দেশে চলে যাই বেশ। এতো পাকা ছেলে, এখনো সাবালক হলে না ! ছিঃ।'

হঠাৎ অন্যমনা হয়ে যাওয়া গৌতম সচেতন হয়ে মৃদু হেসে বলে, 'তোমার ইচ্ছেটার সঙ্গে আমার সাবালক হওয়া না হওয়ার সম্পর্কটা কী বলো তো ? জগতে কি একুশ বছর পার হওয়া কোনো সাবালক জীব নেই ?'

'দেখো, তুমি আমায় রাগিও না।' টুনু ঝঙ্কার দিয়ে বলে, 'তোমার মতন একটা নাবালককে যে ভালোবেসেছি, বিয়ে করতে

চাইছি—এতেই ধন্য হয়ে থাকা উচিত তোমার। অতো ফুটোনী কিসের ?'

'আমাকে ? আমাকে তুমি বিয়ে করতে চাও !'

গৌতম যেন আকাশ থেকে পড়ে।

টুন্নু ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'মাথা ঘুরে গেল, না ? হ্যাঁ চাই। আর তোমার ওই দাদুব সম্মতি আদায় করেই চাই।'

'ওঃ, কল্পনার দৌড় কী বিরাট ! তুমি কি পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মেছো যে দাদুব নাতবৌ হবার স্পর্ধা রাখো ?'

টুন্নু বিচলিত হয় না। দৃঢ় গলায় বলে, 'দৈবায়ত্ত কুলে জন্ম, কিন্তু পুরুষত্ব করায়ত্ত মোর। বিয়েতে তুমিই না হয় ক'নের পার্টটা নিও। কিন্তু লক্ষ্মীটি, চলো না একদিন আমাদেব বাড়িতে। বাড়িতে বসে বেশ যত্ন করে চা খাওয়াতে ইচ্ছে করছে তোমায়। রেস্টুরেন্টের কেবিনে চোর চোর হয়ে বসে ভাল লাগছে না আর।'

গৌতম হেসে বলে, 'আমার বাড়িতে দাদু, তোমার বাড়িতে বাবা ! মেয়ে একটা বয়-ফ্রেণ্ড জুটিয়ে এনে বাড়িতে তুললে নিশ্চয়ই তিনি আহ্লাদে বিগলিত হবেন না। কে দাঁড়াবে জেরার মুখে ?'

'বাবা ? আমার বাবা ?' টুন্নু একটু ব্যঞ্জনাময় হাসি হাসে।

সে হাসিতে বুঝি কৌতুক আছে, বেদনা আছে, হতাশাও আছে।

টুন্নু বলে, 'রাত এগারটা পর্যন্ত বসে না থাকলে তো আমার বাবার জেরার মুখে দাঁড়াবার আশঙ্কা নেই।'

'তাই নাকি ? অতো রাত্তিরে ফেরেন ? ক্লাবে-টাবে যান বুঝি ?'

'যান কোথাও।' টুন্নু গম্ভীর হাস্যে বলে, 'বিপত্নীকের কাছে নাকি সন্ধ্যার শূন্যতা বড় কষ্টকর। বাবার সঙ্গে সব দিন দেখাই হয় না আমার, ঘুমিয়েই পড়ি।'

'ওঃ ! তুমি তাহলে এখন বাড়ি গিয়ে একাই থাকো ?'

'একা কেন ?' টুন্নু কৌতুকে হেসে ওঠে। 'কতো লোক বাড়িতে !

ধরো বামুনদি, বুড়ি ঝি, বুড়ো চাকর, খোকা চাকর—'

'নিজের লোক কেউ নেই?'

টুনু উদাস হাসি হেসে বলে, 'কই আর? সেই জন্যেই তো একটা নিজের লোক জোগাড় করবার তালে ঘুরে বেড়াচ্ছি। নিজের ভার নিজে আর বইতে ইচ্ছে করছে না।'

'তোমার তাহলে একটি বেশ ভারিক্কী গার্জেনতুল্য 'নিজের লোক' দরকার।'

'তোমার পরামর্শের জন্যে ধন্যবাদ।' রেগে ওঠে টুনু।

ওঠবার সময় গৌতম বলে, 'তাহলে বলছো, আমিই সন্ধ্যেবেলা তোমার বাড়ি গিয়ে আড্ডা দেবো?'

'তাই তো বলছি?'

'থাকো তো সেই পাথুরেঘাটায়—'

'সেখানেও মানুষ থাকে।'

'তা নয়, যেতে আসতেই তো—'

'তাহলে যেও না।'

'উঃ, কী রাগ! বলছি এই আড্ডাটি নিশ্চয়ই তোমার ওই বামুনদি কোম্পানী সুচক্ষে দেখবে না।'

'বয়ে গেল।'

'তোমার বাবার কর্ণগোচর করবে—'

টুনু হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে তীব্রস্বরে বলে, 'সেটাই চাই আমি। আমি একটা হেস্তনেস্ত করতে চাই। আর এটাই তার রাস্তা।'

'কী? বাবা যখন তিরস্কার করতে আসবেন', গৌতম হেসে বলে, 'তখন বলে উঠবে, 'এই পাপিষ্ঠই আমার প্রাণেশ্বর'!'

'উঃ, গৌতম, কী পাকা ছেলে তুমি! সত্যি আমার মাঝে মাঝে আশ্চর্য লাগে। তোমার ওই বাড়িতে থেকে—'

'দেখো টুনু, যে গাছ চারিদিকে শিকড় বিস্তারের জায়গা না পায়, সে মাটির গভীরে শিকড় চালায়। আর দুর্ভিক্ষের ভিক্ষুক খাদ্য পেলেই গো-গ্রাসে খায়।'

ওরা ছাড়াছাড়ি হবার জন্যে উঠে দাঁড়ায়।

গৌতমের ভারী মন কেমন করে টুনুর মুখটা দেখে।

ওই রোগা রোগা শুকনো-মুখ টুনু, এখন বাসের ভিড় ঠেলে কতোদূরে যেন যাবে। আর এতো কষ্টের পর যেখানে গিয়ে ঢুকবে, সেখানে ওকে রিসিভ করবার জন্যে শুধু বামুনদি, শুধু বুড়ি ঝি। আর শুধু বুড়ো চাকর, আর খোকা চাকর।

টুনুর বাবা বনেদী বড়লোক। টুনুদের বাড়ির মেঝেয় ছোপ ধরে যাওয়া মার্বেল পাথর। টুনুদের বাড়ির খড়খড়ি শার্সি লাগানো জানলা-দরজার মাথা পর্যন্ত লম্বা লোকেরও সহজে হাত যায় না।

টুনুদের গ্যারেজে দুটো গাড়ি।

একটা হয়তো অকেজো মতো, আর একটা তো ভাল। টুনুর বাবার বিজনেসে খাটে।

তা টুনু যখন বেথুনে পড়েছে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছে, বাড়ি থেকে গাড়ি করেই আসা-যাওয়া করেছে। কিন্তু টুনু যখন সকলের অনুরোধ উপরোধ হিতবাণী সব ঠেলে দিয়ে হঠাৎ খুব একটা উল্টোপাল্টা কাণ্ড করে বসলো, বাবা খাপ্পা হলো।

বাবা বললো, 'গাড়ির এতো সময় নেই যে, সেই মুল্লুকে চারবার যাবে আসবে। যেমন লক্ষ্মীছাড়া বুদ্ধি, তেমনি লক্ষ্মীছাড়ার মতো বাসেই যেও।'

তা সত্যিই তাই যায় টুনু।

লক্ষ্মীছাড়ার মূর্তিতে টেঙশ টেঙশ করে বাসেই যাওয়া আসা করে।

তা হোক। এটাই স্বাধীনতা।

টুনুদের বিচারে আরামের থেকে স্বাধীনতা ভালো।

'কিন্তু এই ভাবেই কি চলতে থাকবে নাকি?' শেষ পর্যন্ত টুনু রেগে বলেছিল, 'আমি একটা বেচারী মেয়ে নয়? রোজ রোজ রাত্তির পর্যন্ত বাড়ির বাইরে থাকতে ভালো লাগে আমার?'

তা রাত্তির পর্যন্ত অবশ্যই।

এখানে সেখানে, লেকে, রেস্টুরেন্টে সাড়ে আটটা পর্যন্ত তো থাকেই ওরা, তারপর এই দক্ষিণাঞ্চল থেকে সেই উত্তরাঞ্চল।

'তোমার আর কি, এই গড়িয়াহাট থেকে টুক্ করে ঢাকুরিয়া। ইচ্ছে করলে হেঁটেও যেতে পারো।' টুন্নু রেগে রেগে বলে, 'আমার ? আমার কথা ভাবো !'

তা টুন্নুর কথা ভাববে এবার গৌতম। টুন্নুর বাড়িতেই যাবে, ঠিক করে।

টুন্নুর নিন্দে হবে ?

টুন্নু তো তাই চায়। ওই নিন্দেটাই নাকি ওর অভীষ্ট সিদ্ধির রাস্তা।

আর গৌতম ?

তাকেও কি বড় হতে হবে না ? একুশ বছর বয়স পূর্ণ হবার জন্যে আরো সাত মাস অপেক্ষা করতে হবে বলে কি বড় হতে বাধা আছে ?

হয়তো একুশ বছর পার হয়ে আরও একুশ বছরের পথ ধরলেও সত্যি 'বড়' হয়ে উঠতে পারতো না গৌতম। ও শুধু ভাবতো 'রোসো, আমি এবার যা ইচ্ছে করবো, আমি কি বড় হইনি ?' অথচ সেই ইচ্ছেটার কোনো চেহারা খুঁজে পেতো না।

টুন্নুর ইচ্ছের প্রাবল্যই ওকে বড় করে ফেলছে।

গৌতমকে আস্ত একটা মেয়ে ভালবেসে মরে যাচ্ছে, বিয়ে করবার জন্যে দিন গুনছে, এর থেকে রোমাঞ্চকর আর কী আছে ?

বড় হয়ে যাওয়ার এটাই তো মূল উপকরণ।

কলেজ থেকে বাড়িতে ফেরা, টুন্নু যাদবপুরে ভর্তি হয়ে পর্যন্তই বন্ধ হয়েছে।

দাদু প্রশ্ন করেন না, কাজেই দাদুর সঙ্গে মিথ্যে কথা বলার প্রশ্ন নেই। জিগ্যেস করে পিসি। মানে, প্রথম প্রথম করছিল, এখন আর করে না। পিসিকে যা-তা বলে বোঝানো যায়।

পিসি ক্রুদ্ধ গলায় বলতো, 'কলেজ ভাঙতেই লাইব্রেরীতে ঢুকিস,

খিদে পায় না ?'

'না তো !'

গৌতম মনে মনে বলে, 'এটা মিছে কথা নয়, খিদে তো পায়ই না। পাবে কেন, খাই তো কোথাও না কোথাও।'

'আমি যে তোর খাবার নিয়ে বসে থাকি।'

'আর থেকো না।'

পিসি ধরা গলায় বলে, 'তা তো বলবিই। এখন বড় হয়ে গেছিস যে। এ তো আর ছোটবেলা নয় যে, ইস্কুল থেকে এসেই দুমদাম করে চেঁচাবি, 'পিসি কী আছে দাও।'

'তোমার নিজের কথার নিজেই জবাব দিলে তুমি পিসি ! এখন আর ছোটবেলা নেই।'

পিসি অন্যদিকে মুখ ফেরাতো। পিসি আস্তে বলতো, 'ছেলেগুলো কী তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায় !'

এখন আর খাবার নিয়ে বসে থাকে না পিসি, কারণ গৌতম একেবারে রাত করেই ফেরে।'

একদিন টুনু কলেজে আসেনি, গৌতম বাড়ি ফিরেছিল। সেই দিন দাদু প্রশ্ন করেছিলেন, 'সন্ধ্যা-গায়ত্রীটা তাহলে ছাড়লে ?'

গৌতম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছিল চোখ নীচু করে, সেইভাবেই বলে, 'সময় হচ্ছে না তো।'

'সময় না হওয়াটা তোমার ইচ্ছাকৃত।' দাদু ভারী গলায় বলেন, 'হঠাৎ সময়ের এতো ঘাটতি হবার কারণ কি ?'

গৌতম চোখ না তুলেই বলে, 'বন্ধু-টন্ধুদের তো ওই সময় ছাড়া পাওয়া যায় না।'

'গায়ত্রী ত্যাগ করে বন্ধুদের সঙ্গে মেশাটাই তাহলে তোমার অভিরুচি ?'

দেবেন্দ্রনারায়ণের মনে পড়ে না, নিজে তিনি বেয়াল্লিশ বছর বয়েস পর্যন্ত 'গায়ত্রী' ত্যাগ করেই কাটিয়েছেন।

গৌতমের কি সেই কথা মনে পড়ে যায় ? না, শোনা কথা মনে

পড়ে না গৌতমের।

গৌতম নিজে থেকেই মাথা তুলে দাছুর দিকে তাকিয়ে বলে, 'ভেবে দেখলাম, সন্ধ্যে না হতেই পাখির মতো ডানা গুটিয়ে বাসায় ফিরে এসে মন্ত্র জপ করার কোনো মানে হয় না।'

'মানে হয় না? ওঃ! তাহলে বেশ ভালো ভালো বন্ধুর সঙ্গেই মিশছো মনে হচ্ছে। বেশ উঁচু স্টাইলে কথাও শিখছো। যাক, আমার কিছু বলার নেই। তা সকালটাই বা বন্ধ করোনি কেন?'

গৌতম গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে না, কিন্তু আর একটা মন্ত্র জপ করে। সে মন্ত্র 'বৃথা ভয় করবো কেন?' তাই গৌতম এ প্রশ্নে সহজ গলায় বলে, 'সকালে তো কোনো অসুবিধে হচ্ছে না।'

'ওঃ!' দাছু বলিষ্ঠ ছুটো থাবা পিঠের দিকে জড় করে একটুক্ষণ পায়চারি করতে করতে বলেন, 'এ শিক্ষা বোধহয় তোমার ওই মামার বাড়ি থেকে আহরণ করা?'

'আমি কোনোখান থেকেই কিছু আহরণ করি না।'

'বন্ধু-টন্ধু সকলেরই থাকে, তবু স্কুল-কলেজ থেকে বাড়ি সকলেই আসে। বেশ তো, তাদের নিয়েই চলে আসতে পারো।'

গৌতম মনে মনে হেসেছিল। কারণ, তখনো টুনু এ বাড়িতে আসেনি।

গৌতম ভেবেছিল, বন্ধুকে নিয়েই চলে এলে তুমি কি আর পায়ের উপর থাকবে বৃদ্ধ মহোদয়, স্রেফ ফেণ্ট হয়ে যাবে।'

মুখে বলেছিল, 'লাইব্রেরী বন্ধ হয়ে যায়। অনেকেই দূর থেকে আসে, চলে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়।'

এটাও আমি মিথ্যা কথা বলিনি—ভেবেছিল গৌতম। টুনু দূর থেকেই আসে। আর লাইব্রেরীও বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু টুনু সেদিন বেড়াতে আসার পর দাছু নাতির বন্ধুর স্বরূপ বুঝে গেছেন।

আর যেন কোনো প্রশ্ন করার নেই তাঁর।

মৃত্যুর পর আর ডাক্তার ডাকতে যাবেন কেন?

পিসিই জেরায় ফেললো। পরদিন বললো, 'মেয়েটা কে রে ?'

'কলেজের একটা মেয়ে। আবার কে ?'

'মেয়েমানুষ হয়ে ইঞ্জিনীয়ার হবে ?'

'কথাটা বড় সেকেলে আর বোকার মতো হলো পিসি !'

'হলো তো হলো। বলি একটা মেয়ের সঙ্গে এতো ভাব কিসের ?'

'এতো ভাব ? এতো ভাবের কী দেখলে তুমি ?'

'দেখলাম বাবা ! সহজে কেউ কাউকে ডাকনামে ডাকে না।'

'বা ! ডাক-ফাক নেই—ওটাই ওর সত্যিকার নাম। কলেজে তো টুনু মজুমদার নামেই পরিচিত।'

'ঢং !' পিসি ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'ওই রকম ঢঙ হয়েছে আজকাল। ভদ্রমতো একটা নামও রাখে না। কী জাত ওরা ?'

গৌতম হঠাৎ হেসে উঠে বলে, 'হঠাৎ ওর জাত নিয়ে পড়লে যে ? কী দরকার ?'

'আছে দরকার।' পিসি গম্ভীর গলায় বলে, 'সবই তো চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছি।'

গৌতম ভিতরে ভিতরে কেঁপে ওঠে।

তবু গৌতম হাসি বজায় রেখে বলে, 'তাহলে তো ওই জাত গোত্র সবই দিব্যদৃষ্টিতে জেনে ফেলবে। মজুমদার কী জাত হয় ? বামুন নয় বলেই মনে হয়। কেন, ঘটকালি করবে ?'

'আমার দায় পড়েছে', বলে উঠে গিয়েছিল পিসি।

আর গৌতম ভেবেছিল একটা মেয়ে একদিন বেড়াতে এলেই যদি এতো সন্দেহ, তবে আর সাবধানতার অর্থ কি ? কেন লুকো-চুরি, কেন অপরাধী ভাব ?

টুনুর বাড়ির বামুনদি কোম্পানীরাও হয়তো শুনতে চাইবে 'ছেলেটা কী জাত।' যাক। গৌতম আর দ্বিধা করবে না।

টুনু বললো, 'আজ একটা ট্যাক্সিতে যাই চলো।'

গৌতম ভুরু কুঁচকে বলে, 'কেন' ?

'ভয় নেই বাবা, ভয় নেই। তোমায় নিয়ে পালাবো না। এমনি ইচ্ছে করছে। আজ তুমি প্রথম যাবে আমাদের বাড়ি !'

'আমার অতো পয়সা নেই।'

'বাঃ, আমার কাছে তো আছে।'

'পৌরুষে বাধবে। অনেকদিন তুমি খাইয়েছ। আজ আবার গাড়ি চড়াবে। উঁহু।'

টুনু মলিন মলিন গলায় বলে, 'সব ধারের হিসেব রাখছো বুঝি ? ঠিক আছে, পরে সুদসুদ্ধ নেবো।'

'সেই পরটা কবে আসবে ? একমাত্র ভরসা তো লটারী। যা অন্য লোকে পায়। নিজেরা কেউ কখনো পায় না।'

'পাশ করে বেরিয়ে তুমি কাজ পাবে না বুঝি ?'

'ওই আনন্দেই থাকো।'

'যাকগে যাক, আজ আমার কথা শোনো লক্ষ্মীটি। কিছুক্ষণ বেশ জগতের সবাইয়ের চোখ এড়িয়ে শুধু আমরা। ভাবতে ভালো লাগে না তোমার ?'

শেষ পর্যন্ত টুনুরই জিত হলো।

গাড়িতে বসে টুনু আহ্লাদে গলায় বলে, 'কেমন ভালো হলো বলো তো ?'

'খুব ভালো।'

'আচ্ছা পাশ করে বেরোবার আগেই তোমার একুশ বছর বয়েস হয়ে যাবে, তাই না ?'

গৌতম হেসে উঠে বলে, 'তোমার মাথা থেকে এই একুশে পোকাটা তো যাচ্ছে না। শিবঠাকুরের আপন দেশে পাঠিয়ে দেওয়া যাক তোমায়। যেখানে কেবল একুশের ছড়াছড়ি।'

টুন্নু জানলার বাইরে তাকায়।

টুন্নুর রোগা কালো গ্রীবার ভঙ্গিমাটিও অভিমানের ছোঁওয়ায় সুন্দর দেখায়।

টুন্নু বলে, 'আমাব সব কথা তো জানো না।'

'বেশ, জানাও।'

'জানাবো। জানাবো বলেই তো—।'

টুন্নু ওব একটা হাত চেপে ধবে।

টুন্নুকে দেখলে নেহাতই হা-ঘরের ঘরেব মেয়ের মতো দেখায়। কিন্তু সবাই জানে টুন্নু বডলোকেব মেয়ে।

ট্যাক্সির ভাডা মিটিয়ে টুন্নু যখন বেণী দোলাতে দোলাতে বলে, 'চলো', তখন গৌতম নতুন কবে হৃদয়ঙ্গম কবে, টুন্নু বডলোকের মেয়ে। অথচ কী অদ্ভুত লক্ষ্মীছাড়ার মতো বেড়ায়, ভাবলো গৌতম।

টুন্নু গৌতমকে যে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো, সে ঘরের চেহারাটায় কিছু আধুনিকতার প্রলেপ পড়েছে।

এ ঘরে বাড়ির সাবেকী ড্রইংরুমের মতো জানলায় দরজায় রেশমি দড়ি বাঁধা পুরনো ভেলভেটের পর্দা দোদুল্যমান নয়, হ্যাণ্ডলুমের পর্দা। ঝালর ঝোলানো ভারী ভারী সোফা সেটের পরিবর্তে, হালকা আধুনিক আসবাব।

শুধু ঘরের দেয়ালে একটা পাথরের পরীর হাতে দেওয়াল ঘড়ি, আর মেঝে থেকে ছ' ফুট উঁচু একটা দাঁড় করানো আয়না পুরনো দিনের ফ্যাশন বহন করছে, যে জিনিস সর্বদাই দর্শকের সপ্রশংস দৃষ্টি আদায় করে নেয়। এটা টুন্নুর বাবার আধুনিক ড্রইংরুম। বাবার বিজনেসের বন্ধুরা এ ঘরে এসে বসেন।

তবে সম্প্রতি সন্ধ্যেবেলা আর এ ঘরে জমজমাটি আসর বসে না। ভদ্রলোক এক নতুন নেশায় মেতেছেন। সেখানেই রাত দশটা পর্যন্ত কাটে।

টুন্নু বললো, 'বোসো একটু। কোনোদিনই তো কলেজ ফেরত স্নান হয় না, আজ একটু স্নান করে আসি।'

'এসো। কিন্তু—' গৌতম বলে, 'তোমাদের বারান্দার ওধারে একটা অ্যালসেশিয়ানকে ঘুরতে দেখলাম। ওকে বাঁধো।'

টুন্নু খিলখিল করে হেসে ওঠে, 'কুকুরকে ভয় পাও বুঝি? ও কিছু করবে না।'

'করুক না করুক, ওকে না বাঁধলে স্রেফ উঠে পালাবো।'

'উঃ, বাবা!' টুন্নু চাপা একটু ঝঙ্কার দিয়ে বলে, 'ঠিক আছে। তোমায় বাঁধবার জন্যেই ওকে বাঁধতে হবে। কুকুরে ভয়, মেয়েতে ভয়, তুমি কী!'

'মেয়েতে ভয় মানে?'

'ভয় না তো কী? ট্যাক্সি শুনেই তো মুখ শাদা হয়ে গিয়েছিল।'

'বাজে কথা বোলো না।'

'বাজে বৈকি।' বলে হাসতে হাসতে চলে যায় টুন্নু।

বিশেষ একটা সুরে কুকুরটাকে ডাক দিয়ে নিয়ে চলে যায় বোধহয় বাঁধতেই।

একা ঘরে বসে গৌতম ভাবে, আচ্ছা, আমি কি সত্যিই ভীতু? কই? আমার পরিবেশে এর থেকে আর কতো সাহসী হবো? টুন্নুর মতো আমার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আছে? ও শুকনো চেহারা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু টাকা-পয়সা খরচ করে প্রচুর। আমার তো যা কিছু বাড়তি সবই চাইতে হবে। চাইবার ভয়ে আমি বাড়তি খরচের দিকে যেতে পারি না। টুন্নুকে কি এতো কথা বলা যায়?

আর কুকুরের কথা? কুকুরকে কি আমি আগে ভয় করতাম? ছেলেবেলায় তো কুকুরছানা নিয়েই খেলা ছিল আমার। বড় কুকুরও তো ছিল বাড়িতে।

কিন্তু বাবাকে যখন নিয়ে গেল, সেই কুকুরটা হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে কী ভীষণ আর্তনাদ করতে করতে মাকে তাড়া করলো!

মালী আর রামলগন দু'জনের কেউ ওর কাছে যেতে পারলো না।···কোন একজন বাবু চীৎকার করে বলতে লাগলো, 'ক্ষেপে গেছে, গুলি কবা হোক।' কিন্তু গুলি-টুলি কেউ করতে এলো না।···আমি লোহার গেটের পাশের পিলারটার ওপর উঠে পড়ে (খেলবার জন্যে প্রায়ই যেখানে উঠতাম আমি) পরিত্রাহি চেঁচাতে চেঁচাতে দেখতে পেলাম, মা পাগলের মতো রাস্তায় ছুটোছুটি করে ইরামাসীদের বাড়িতে ঢুকে পড়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে প্রাণ বাঁচালো। মা'র শাড়িটা ওদের দরজার বাইরে পড়ে থাকলো।

কুকুরটা সেই বন্ধ দরজায় কী আছড়ানো আছড়াতে লাগলো, আমার মনে হলো দরজা ভেঙে ফেলে ঘরে ঢুকে পড়ে মাকে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলবে ও।

রামলগনরা দূর থেকে থান ইঁট মেরে মেরে ওকে আধমরা করে দিলো, ওই দরজাটার সামনে দুই পা প্রসারিত করে শুয়ে পড়লো ও।

জানি না ও মরে গিয়েছিল, না বেঁচে উঠেছিল। দাদুর সঙ্গে তো চলেই এলাম আমরা। কে জানে, পরদিন না আরো পারে। তবে কুকুরটাকে আর দেখিনি। তার সেই হিংস্র মূর্তিটাই আমার মনের মধ্যে দেগে বসে আছে।

কিন্তু এতো কথা কি টুনুকে বলতে যাবো আমি ?

অনেক লোকেরই কুকুরে ভয় থাকে, আমারও আছে। ব্যস। সবাই যে টুনুর মতো ডাকাবুকো হবে তার মানে নেই।

টুনু দোতলায় উঠে বাথরুমে যেতে যেতে ডাকলো, 'বামুনদি !'

বামুনদি একগাল হেসে এসে দাঁড়ালো, 'আজ যে বড় দিদিমণির এক্ষুনি আবির্ভাব ঘটলো। তোমার বিকেলের মুখ তো ভুলেই গেছি।'

'আর ভুলবে না।' বলে হেসে উঠে টুনু বলে, 'আমার একটি বন্ধু এসেছে, চট করে তাকে কি খাওয়াতে পারবে বলো তো ?'

বন্ধু এসেছে শুনে খুশি হয় বামুনদি।

আগে আগে তো ইস্কুল-কলেজ থেকে মেয়ে জুটিয়ে এনে বাড়িতেই আড্ডা বসাতো টুনু। বামুনদির ওপর চা জলখাবারের ফরমাস করতো অবলীলায়।

বামুনদি টুনুর মায়ের আমলের লোক। অনেক দিনেরই লোক, টুনুর মায়ের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সংসারের দিন দেখেছে সে, অসুখে পড়ে থাকা মলিন দিন দেখেছে, মৃত্যুও দেখেছে। টুনুর মায়াতেই পড়ে আছে সে। তাছাড়া বলতে গেলে সংসারের কর্ত্রীর পদটা তো প্রায় তারই এখন। টুনুর সব আবদার হাসিমুখেই সয় সে।

বামুনদি অনেকদিন পরে কৃতার্থ হয়।

বামুনদি বিগলিত গলায় বলে, 'তুমিই বলো কী খাওয়াবো ?'

'কী করেছো বিকেলে ? ভালোটালো করোনি কিছু ?'

বামুনদি কপালে করাঘাত করে, 'হায় ভগবান! বিকেলে ভালো জলখাবারের পাট আর আছে নাকি ? তুমিও ফেরো না, বাবুও ফেরেন না, সন্ধ্যেবেলা গুচ্ছির পরোটা করে আমরা লোক-জনেরা গিলি।'

'খুব ভাল কাজ করো—' টুনু হেসে উঠে বলে, 'এখন আমাদের গেলাবার জন্যে যা করতে পারো করো। ভালো হওয়া চাই। আমি চান করে আসছি।'

বামুনদির প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ওপর আস্থা আছে টুনুর।

বামুনদি দু'চার মিনিটে অতিথি বিনোদনের আয়োজন মজুতই রাখে।

টুনু বাথরুমে ঢুকে যাচ্ছিল, বামুনদি হেঁকে বললো, 'ক'টা মেয়ে ?'

মেয়ে! টুনু হেসে উঠে বলে, 'মেয়ে' আবার কখন বললাম তোমায় ? ছেলে। একটা মোটে।'

বাথরুমের দরজা বন্ধ করে হেসে কুটিকুটি হয় টুনু।

বুড়ি এখন চোখ কপালে তুলে মরুক।

তা চোখ কপালে না তুললেও, চিন্তিত না হয়ে পারলো না

বুড়ি। তলে তলে হচ্ছে একটা কিছু। না হলে এমন করে নিড়ুবি হয়ে থাকে মেয়ে? এক-একদিন রাত নটার আগে বাড়ি ফেবে না। জিগ্যেস করলেই বলে, 'ওঃ, সে দারুণ পড়া! তুমি কি বুঝবে বুড়ি?'

সম্প্রতি আবার বলেছিল, 'একটা ছেলে পড়ানো ধরেছি।'

বামুনদি কপালে হাত রেখে বলেছিল, 'তোমাব বাপের পয়সা কে খায় তার ঠিক নেই, তুমি করছো ছেলে পড়ানো?'

'পয়সাই কি সব বামুনদি?' টুনু করুণ করুণ গলায় বলেছিল, 'সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে কি করবো শুনি? বাবাকে তো চক্ষে দেখি না।'

কথাটায় কাজ হয়েছিল। বামুনদি বলেছিল, 'কি আর বলবো ভাই, তোমাবই কপাল। নইলে এতো বড় মেয়ে ঘরে, বাপ কোথায় তার বিয়ের ব্যবস্থা করবে তা নয়, কোথায় ভেসে বেড়াচ্ছে।'

তা, সেদিন বামুনদির সন্দেহ হয়নি।

'ছেলে পড়ানো' বলতে বামুনদির একটা হাফ প্যান্ট পরা বালকের মূর্তিই চোখে ভেসেছিল। আজ ভাবলো, একবার বলছে বন্ধু, আবার বলছে ছেলে! কই, এ পর্যন্ত তো বাড়িতে ছেলেবন্ধু এনে জোটায়নি। সন্ধ্যেবেলা কি একেই পড়ানো চলছে নাকি?

হবেই তো, বাপ যেমন ভাসিয়ে দিয়েছে। গাড়ি করে কলেজে যাবে-আসবে মেয়ে, তা নয়, তাকে মাঠে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। হোক এখন একটা কিছু অঘটন।

চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে হাত চলছিল বামুনদির নির্ভুল। ফ্রিজ থেকে মিষ্টি বার করে সাজালো। ডিমের পুর দিয়ে কচুরি ভেজে ফেললো, চা বানালো, মিহি করে আলু ভাজলো।

খাবারের প্লেট হাতে করে সদ্য স্নান করা টুনু যখন ঘরে ঢুকলো, তখন তার সারাদিনের লক্ষ্মীছাড়া চেহারায় চমৎকার একটি লক্ষ্মীশ্রী ফুটেছে। সাদা শাড়ি ছাড়া কোনোদিন কলেজে যায় না টুনু, সেই

মূর্তিটাই দেখেছে গৌতম। আজ দেখলো, টুনু একটা হালকা নীল রঙের শাড়ি পরেছে। তার সেই টান টান করে বাঁধা চুলটা খুলে ছড়িয়ে দিয়েছে মুখের চারপাশে। ছড়িয়ে আছে চুলগুলো। জল ঝরছে আগা দিয়ে।

গৌতম বলে উঠলো, 'উঃ, খুব যে সেজেগুজে আসা হলো। দেখে লোভ হচ্ছে।'

টুনু দাঁড়িয়ে পড়ে ব্যঞ্জনাময় একটু হেসে বলে, 'লোভ হচ্ছে? কী ইচ্ছে করছে?'

'ইচ্ছে করছে তোমার মতো প্রাণভরা একটু স্নান করে আসি।'

টুনুর মুখটা একটু কালো দেখায়। তবু টুনু সামলে নেয়।

বলে, 'লোভের দৌড় এই পর্যন্ত! সাধে বলি খুন করতে ইচ্ছে করে! এখন দয়া করে খাও দিকি।'

'কই, তোমার কই?'

'বামুনদি আনছে।'

'আবার বামুনদি কেন?' গৌতম অস্বস্তির গলায় বলে, 'এক-সঙ্গে নিয়ে এলেই হতো?'

'বাঃ! বামুনদিকে পাত্র দেখাবো না?'

গৌতম রাগ রাগ গলায় বলে, 'দেখো, বড্ড বাড়াবাড়ি করছো তুমি। এই রকম করবে বুঝি? তাহলে কে আসবে?'

টুনুর মুখটা যেন নিভে যায়।

টুনু মলিন গলায় বলে, 'তুমি আমার অবস্থা তো জানো না।'

'জানবো না কেন। এখন তো আরো ভালো করেই জানলাম। বাড়ি ঢুকলে মার্বেল প্পাথরের সিঁড়িতে পা ফেলে ফেলে, লোক-জনকে ফরমাস করলে, হাতের কাছে খাবার এসে গেল, এখন পাখার তলায় বসে খাবে।'

টুনু আস্তে হেসে বলে, 'এ সমস্তই বহিরঙ্গ গৌতম! ভেতরে অনেক সমস্যা।'

'একটা বিয়ে করতে পারলেই সব সমস্যা ঘুচে যাবে ?'

'সব, সব। সমস্ত। বিয়ে না করলে তো এ বাড়ি থেকে পালাবাব উপায় নেই।'

'বুঝলাম না। বাড়িতে কি ভূত আছে ?'

'নেই। তবে ভূতেব থেকে ভয়াবহ কিছু আসবার জন্যে প্রস্তুতি চলছে।'

'আর একটু প্রাঞ্জল কবে বললে হতো না ?'

'আজ থাক গৌতম। আজ তুমি প্রথম এলে !'

কিন্তু সেই প্রথম আসা থেকে অনেকবারই আসে গৌতম। বলতে গেলে টুন্নু টেনেই নিয়ে আসে।

কিন্তু গৌতম বলে, 'আমার কিন্তু তোমাদের এই বিরাট বাড়ি-খানার থেকে 'নিরালা'র সেই কেবিনটাই বেশী ভালো লাগে।'

'আমারও লাগে না তা নয়,' টুন্নু বলে, 'কিন্তু আমি তোমায় একটা বাড়িব মধ্যে পেতে চাই গৌতম। তাহলে যেন বল পাই, যেন বিশ্বাস আসে।'

তারপর বলে, 'আচ্ছা গৌতম, ম্যারেজ রেজিস্ট্রারকে বলে-কয়ে দু-চার মাস বয়েসটা বাড়িয়ে নেওয়া যায় না ?'

টুন্নু অবিরত বিয়ের স্বপ্ন দেখছে।

কিন্তু গৌতম ? গৌতম কি সত্যি ভাবতে পারছে, সাবালকের পর্যায়ে উঠলেই সে বিয়ের জন্যে দরখাস্ত করতে পারবে ?

টুন্নু এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে চায়, যাবার জন্যে ছটফট করছে (যদিও কারণটা আজ পর্যন্ত খুলে বলেনি) কিন্তু গৌতম তাকে কোন্ বাড়িতে তুলবে ? গৌতমের সেই দাদুর বাড়িতে ? এর থেকে অবাস্তব কল্পনা আর কী আছে ?

কথাটা একদিন তুললো গৌতম।

সেদিন ওরা 'নিরালা'র কেবিনেও ঢোকেনি, পাথুরেঘাটার সেই

পাথর বাঁধানো বাড়িটাতেও যায়নি। ওরা বুদ্ধ মন্দিরের বাগানে এসে বসেছিল।

গৌতম বললো, 'ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে গিয়ে পড়াটাই তো শেষ কথা নয় টুনু, তারপর?'

টুনু আলগা গলায় বলে, 'তারপর আমরা সুন্দর একটি ফ্ল্যাট নেবো—'

'ম্যারেজ রেজিস্ট্রার বোধহয় সই-সাবুদের পর বড় এক থলি টাকা দেবে?'

'ঢং কোরো না।' টুনু রুমাল বার করে ঘাড় মুছতে মুছতে লজ্জা লজ্জা গলায় বলে, 'তুমি তো আমায় কোনো কথা বলতেই দাও না। নইলে কবেই জানতে পারতে, মায়ের বাপের বাড়ি থেকে পাওয়া পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার নামে তোলা আছে। শর্ত হচ্ছে, বিয়ের সময় পাবো। অর্থাৎ বিয়ের যৌতুক।'

গৌতম কোনোদিন শোনেনি একথা। গৌতমের হঠাৎ ভয়ঙ্কর একটা কষ্টে সমস্ত শরীর তোলপাড় করে ওঠে।

গৌতমের হঠাৎ নিজেকে খুব অকিঞ্চিৎকর লাগে। টুনুর এতো আছে, গৌতমের পঞ্চাশটা টাকাও নিজের বলে নেই।

আর হঠাৎই গৌতমের টুনুকে একটি ঘুঘু মেয়ে মনে হয়।

ওঃ তাই! তাই বিয়ের জন্যে এতো ব্যস্ততা!

ওই বিরাট অঙ্কের টাকাগুলি হস্তগত করবার জন্যে ছটফটানি ধরেছে, তাই যে করে হোক একটা বিয়ের দরকার। তার মানে, যেমন সাদাসিধে সরল আর ভালবাসায় ভরা মেয়ে মনে হতো, তা নয়।

অনেক টাকা দিয়ে গেছে ওর মা, সেই টাকায় বর কিনে পুষতে চায়।

আর সেই পোষ্য প্রাণী হিসেবে গৌতমকেই সে পছন্দ করেছে। যেমন ওদের বাড়ির সেই বিরাট অ্যালসেশিয়ানটাকে চোখের ইসারায় চালায়, ভেবেছে তেমনি চালাবে পোষা বরটাকে।

টুনুর এতদিনের সমস্ত আকুলতা, সব রহস্য জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায় গৌতমের চোখে। আর সেই যে একটা কারণ রোজ রোজ না বলে রেখে দেয়—সেই কারণটাও ধরা পড়ে যায়।

ওর নিজের একুশ বছর বয়েস হয়ে গেছে, ও আর অপেক্ষা করতে পারছে না, গৌতমকে তাই জোচ্চুরী করে সাবালক সাজাতে চাইছে।

গৌতমের মনে হয়, টুনুর মুখটা কী কাঠ কাঠ, টুনুর সামনের দাঁত দুটো কী বিশ্রী রকমের উঁচু, টুনু কী কালো!

আমি ওকে এতোদিন ভালবাসার চোখে দেখেছি বলে চোখে পড়েনি, ও এতো বিশ্রী দেখতে।

গৌতম তীব্রগলায় বলে ওঠে, 'ওঃ, তাই বুঝি? বিয়ের জন্যে এতো ব্যস্ততার কারণ ওই টাকা! ওটা হস্তগত করবার জন্যে—'

'কী বললে?'

গৌতম ঠিকরে দাঁড়িয়ে উঠে রূঢ় গলায় বলে, 'যা সত্যি তাই বলেছি। কিন্তু তোমার যখন ওই টাকাটা করতলগত করাই উদ্দেশ্য, তখন আর গরীব ব্রাহ্মণের নাতিটাকে কেনবার চেষ্টা কেন? টাকার লোভে বিয়ে করতে ছুটে আসবে এমন সুপাত্রের তো অভাব নেই বাংলাদেশে।'

টুনু বসে পড়ে। টুনু রুদ্ধ গলায় বলে, 'গৌতম!'

'আর অভিনয় করে কী করবে টুনু, সত্যটা বড় বেফাঁসভাবে প্রকাশ হয়ে গিয়েছে। তবে এইটাই শুধু ভেবে অবাক হচ্ছি, আমার মতো একটা ভুল লোক বাছতে গেলে কেন তুমি? যার জন্যে তোমায় এখনো ছ'মাস অপেক্ষা করতে হবে। অঙ্কয় তো তুমি ভালো, এ অঙ্কটা এমন কাঁচা কষলে কেন?'

টুনু আবার উঠে দাঁড়ায়। গম্ভীর গলায় বলে, 'তোমার ভুল ভাঙাবার চেষ্টা আমি এখন করবো না গৌতম। নিজেই ভুল ভাঙবে। আচ্ছা চলি।'

'গাড়ি চড়ে ওরা কোথায় গেল রে রবি ?'

ছোট ছেলেকে ডেকে প্রশ্নটা করে বুলিবুলি পাখি।

বড় ছেলে রবি তো কথাই কয় না, নেহাত বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে বাড়ির ভাগ সম্পর্কে কিছু ফাঁকে পড়ে যাবে, তাই একই বাড়িতে ভিন্ন গোত্রের মতো বৌ ছেলে নিয়ে বাস করছে সে।

তাছাড়া মা'র ওই আহ্লাদী ছোট মেয়ের এ সংসারে ঢোকা পর্যন্ত রাগে হাড় জ্বলে গেছে তাদের। সুমিতা যতই বড় বৌদিকে 'লাল গোলাপ, লাল গোলাপ' ডেকে আদিখ্যেতা করুক, সাড়া দেয় না লাল গোলাপ।

একথা সত্যি, সুমিতা যখন প্রথম তার দুর্ভাগ্যের উপর আবার শাসনের শাস্তির জ্বালায় ছটফটিয়ে এখানে ছুটে এসেছিল, সহানুভূতি কম হয়নি তার। তার উপর আবার বেচারীর ছেলে আটকে রাখা হয়েছে।

লাল গোলাপই উত্তেজিত হয়ে বলেছে, 'তোমরা চুপ করে থাকবে ? কেস করুক সুমিতা। মায়ের কাছ থেকে বাচ্চা ছেলে কেড়ে রাখার আইন কোথায় আছে ?'

কিন্তু সুমিতাই সেই উত্তেজনা প্রশমিত করে দিয়েছে উদাস বৈরাগ্যের বাণী দিয়ে। বলেছে, 'কাড়াকাড়ি করে কী পাবো লাল গোলাপ ? ছেলে 'দাদু'র কেনা গোলাম। আমাকে দেখতেই পারে না। বাপ মরে পর্যন্ত আমি যেন ওর দু'চোখের বালাই হয়েছি।'

'ওমা ! সে কী ? কেন ?' সবাই বলেছে সমস্বরে।

সুমিতা আরো করুণ গলায় বলেছে, 'ভগবান জানেন। থাক্, যেখানে ভাল থাকে থাক। এরপরে আবার ওর ঠাকুরদা বলে বসবেন—ছেলের শিক্ষা হয়নি।'

বুলবুলি পাখি এ অপমান গায়ে রাখেনি, ফোঁস্ করে উঠে বলেছে, 'কেন ? আমার ছেলেরা মুখ্যু ?'

'ওঁর মতে—' সুমিতা হেসেছে ম্লান করুণ। 'বি এ এম এ পাশকে উনি শিক্ষা বলেন না। সংস্কৃত শেখা চাই। উপনিষদের

বাণী'মুখস্থ করা চাই। বলেন কি—তোমার ভাইদের পৈতে তো ধোবার বাড়ি যায়, তাই না বৌমা ?'

'সেকেলের চরম।' মুখ বাঁকিয়েছিল লাল গোলাপ।

তারপর লাল গোলাপই বলেছিল, 'নিরিমিষ খাবি মানে ? চললাম আমি তোব জন্যে নিরিমিষ রান্নাঘর বানাতে। দায় পড়েছে ! কেন, মা'র থেকে বেশী পুণ্যবতী হয়ে উঠতে চাস বুঝি ? মা নরকে যাবেন, তুই স্বর্গে যাবি ?'

লাল গোলাপই বলেছিল, 'আমাদেব মাঝখানে ঘুরে বেড়াবি তুই ওই ঝিয়ের মতো কাপড় পবে ? বলিহাবী তোর শ্বশুরকে বাবা। প্রাণে একটু মায়াও হয়নি।'

তার মানে ববিব বৌয়েব প্রাণে মায়া ছিল। ববির বৌ দুর্ভাগিনী ননদটাকে একটু স্নেহের পরশ দিতে চেয়েছিল। তার অন্ধকার-হয়ে-যাওয়া জীবনে একটু মোমবাতি জ্বেলে দিতে হাত বাড়িয়েছিল।

হৃদয়বত্তারই পরিচয় দিয়েছিল।

শুধু ধারণা ছিল না তার, সেই বাতিব আলোকটুকুকেই আগুন করে তুলবে সুমিতা। আর সেই আগুনে ইন্ধন দিয়ে দিয়ে আপন চিতাশয্যা রচনা করবে।

চিতাশয্যাই। শুধু নিজেরই নয়, চিতাশয্যা নীতির, সভ্যতার, শালীনতার।

হয়তো এই ভয়েই এতো বাঁধ দেওয়ার ঘটা। হয়তো বুদ্ধিমানেরা জানে মানুষকে বিশ্বাস নেই। আর এও জানে, বাঁধ ভেঙে দিলে সীমানার সীমা রাখা বড় কঠিন।

জানতো না বলেই নিজের ভুল বুঝতে পারেনি লাল গোলাপ। এখন দারুণ চটে গেছে ওই অসভ্য মেয়েটার ব্যবহারে। উনচল্লিশ বছরের মহিলাকে যদি 'মেয়ে' বলা যায়।

মা'র প্রশ্রয়েই এটি হয়েছে। এই কথাই বলেছে ববি।

ববিই তো গাড়ি পাঠিয়ে পাঠিয়ে বোনের ছেলেটাকে তার

মা'র তৃষিত মাতৃচিত্তের কাছে এনে ধরে দিয়েছে। কারণ, ও দেখতো সন্ধ্যাবেলা একা একা ছাদে ঘুরে বেড়াচ্ছে সুমিতা।

মা বলতো, 'একা ছাদে কেন রে সুমি? ভাইপো-ভাইঝিদের নিয়ে লুডো-টুডো খেল না?'

সুমিতা বলতো, 'ভাল লাগে না।'

তার মানে নিজের ছেলেটি না হলে ভালো লাগবে না।

কিন্তু সে ওষুধ কাজে লাগলো না।

ছেলে আসে বটে, মায়ের দিক ঘেঁষে না। ওই মামাতো ভাই-বোনেদের সঙ্গে কাটায়।

ফের দিন গাড়ি পাঠাতে দেখলে সুমিতা ঠোঁট উল্টে বলতো, 'এসে তো আমার সবই করবে। ছেঁড়া ফুল খোঁপায় লাগে না, বুঝলে ববি? ওর মন থেকে আমায় কেটে দিয়েছেন ওঁরা।'

দাদা বলার পাট নেই এদের বাড়িতে, ছোটরাও বড়দের নাম ধরে ডাকে।

দাদা বলেছিল, 'ওরা কেটে দিয়েছে। জোড়া লাগা? তুই তো মা।'

কিন্তু সুমিতা যেন ও কথাটা ভুলেই যেতে চেয়েছে।

সুমিতা ক্রমশঃ একা ছাদে ঘোরা ছেড়ে দিয়ে হুড়ে হয়ে উঠেছে। সুমিতা শাড়ি জামার হালকা একটু রঙের রেখার পথ দিয়ে টেনে এনেছে সব রং, সব রস, সব সুষমা, সব ঔজ্জ্বল্য।

তারপর কবে যেন ছোড়দা রবি খাল কেটে কুমীর এনেছে।

ডেকে এনেছে তার বিজনেসের বড়ো পার্টনার মজুমদারকে।

মজুমদারকে হাতে রাখা বড় দরকার!

তাছাড়া ব্যবসার শলা পরামর্শ করতে রবিকেই ছুটতে হতো ওর কাছে অত মাইল দূরে।...এখন সে ক্লেশটা বেঁচেছে।

রবির বৌ ওইটুকুতেই প্রীত।

নিত্য সন্ধ্যাবেলা বর ছুটতো পার্টনারের বাড়ি; আর নিত্য এসে বলতো, 'লোকটাকে ঠিক বোঝা যায় না। কোনদিন না বলে

বসে—ব্যবসা তুলে দেবো।'

এখন আর সে ভয় নেই।

এখন ওই প্রায় প্রৌঢ় লোকটাকে জালে তুলতে ভালো একটি টোপ জোগাড় করে ছিপ নিয়ে বসে আছে রবি।

রবির বৌ, যাকে 'নীলগোসাপ' বলে সুমিতা, সে শুধু বরের কাছে হেসে হেসে বলে, 'খুব রক্ষে যে কালো হয়ে জন্মেছি, নইলে তুমি নির্ঘাৎ আমাকেও 'টোপ' করতে। তোমায় বিশ্বাস নেই।'

অতএব বোঝা যায় সকলের নীতিজ্ঞান সমান নয়।

ববির বৌ যাতে ঘৃণায় ধিক্কারে কঠিন হয়, রবিব বৌ তাতেই হেসে গড়ায়।

বুলবুলি পাখি যখন প্রশ্ন করলো, 'গাড়ি করে ওরা কোথায় গেল রে রবি?'

রবির আগেই রবির বৌ উত্তর দিলো, 'গাড়ি চড়ে সন্ধ্যাবেলা কোথায় আর যায় মানুষ মা? গঙ্গার ধারে কি গড়ের মাঠে।'

রবির মা ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে বলে, 'তা হঠাৎ গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যাবার দরকারটা কী হলো রবি?'

রবি রুক্ষ গলায় বলে, 'সেটা আমায় জিগ্যেস না করে যারা গেল তাদের জিগ্যেস করলেই পারতে। তবে গেলেই বা কী পৃথিবী উল্টে যাবে তাও তো বুঝি না।'

মা বোধকরি আজ মরীয়া হয়েই ছেলের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে এসেছিল। তাই আরো রাগের গলায় বলে, 'বুঝবে না কেন? বাঙালীর সমাজে বাস করো না? 'লোকনিন্দে' কথাটার মানে জানো না?'

'লোকনিন্দে?'

রবি হেসে উঠে বলে, 'হঠাৎ ভূতের মুখে রাম নাম কেন মা? তুমি তো কই ওই লোকনিন্দে জিনিসটার ধার ধারো না। বাঙালীর

সমাজে তো বিধবার শাড়ি চুড়ি পরা, মাছ মাংস খাওয়া সব কিছুতেই নিন্দে।'

বুলবুলি পাখি ঠোঁট কামড়ায়। বুলবুলি পাখি বুঝতে পারে, সুযোগ পেয়ে ছেলে আজ তাকে দংশন করলো।

নিজেই তো সে বলেছে, 'আমি ও সব কুসংস্কার মানি না।'

কিন্তু খাওয়া জিনিসটা তো গৃহগণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ।

এটা কী? এ যে উচ্ছন্ন যেতে বসেছে সুমিতা।

আর সেটা বসেছে চল্লিশ বছর বয়েসে। চব্বিশ বছর হলে বুঝি এতো লোকলজ্জা, এতো অস্বস্তি হতো না বুলবুলি পাখির।

বহু দিনের ভয় ভুলে, বুলবুলি ছেলের মুখের কাছে আঙুল তুলে বলে, 'এই তুমি, তুমিই এইটি করলে, তুমিই! তুমিই!'

রবি কি উত্তর দিতো কে জানে, ঠিক সেই সময় কোথা থেকে যেন ঘুরে এসে আহ্লাদে ছল ছল করতে করতে সুমিতা এসে ঢুকলো, 'ওমা গো, তোমার এই ছোট মেয়েটা কি ভুলো গো! বাড়ির চটি পরে বেরিয়ে গেছি। তোমার ওই মজুমদারটিও তেমনি রবি! ইয়ায়ের রাজা! বলে কিনা—কে আপনার চরণ কমলের দিকে তাকাচ্ছে?'

হি হি করে হেসে গড়িয়ে পড়ে সুমিতা, হালকা সিল্কের শাড়ির খাটো আঁচলটা বুক থেকে প্রায় খসেই পড়ে তার। কোনো মতে তার কোণটুকু কাঁধে তুলে, বাড়ির চটি ছেড়ে, বাইরের চটি পরে প্রায় হালকা হাওয়ার মতো ভেসে চলে যায় সুমিতা। মনে হলো একটি সদ্য-তরুণী খুশির নৌকোয় পাল তুলে বেরিয়ে গেল।

সুমিতার গঠন ভঙ্গীতে এখনো তরুণীর লাবণ্য, তরুণীর নমনীয়তা। চল্লিশের সুমিতাকে বোধকরি সহসা 'চব্বিশ' বলে চালানো যায়।

সুমিতা যদি তার সেই কঠোর-নীতি শ্বশুরের কাছে পড়ে থাকতো, আর তার অকালবৃদ্ধা ননদের সঙ্গে এক ছাঁচে জীবন

যাপন করতো, সুমিতা নিশ্চয় এতোদিনে একটি হলুদরঙা শীর্ণকায়া প্রৌঢ়ায় পরিণত হতো। কিন্তু সুমিতা পিতৃগৃহের আরাম আয়েসের মধ্যে নিশ্চিন্ত কুমারী জীবনে লালিত হচ্ছে।

সুমিতা এযাবৎ খেয়েছে ঘুমিয়েছে, আর ফ্যাশান পত্রিকার পৃষ্ঠা উলটে উলটে নির্দেশ সংগ্রহ করে লাবণ্য বৃদ্ধির চর্চা করেছে। সুমিতা বোধকরি ভুলেই গেছে সে কুমারী নয়, তার একটা অতীত ছিল। হয়তো ইচ্ছে করেই ভুলেছে। তাই ওর মনের জগতে গৌতম নামের ছেলেটার স্থান হয়ে গিয়েছে ভাইপো-বোনপোর সামিল।

তাই গৌতম অনেক দিন পরে এসে দাঁড়ালেও সুমিতা মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহক্ষুধা নিয়ে ছুটে আসে না!…'গৌতম এসেছিস? বোস' বলে কুকুরছানা নিয়ে লাফালাফি করে মেতে থাকতে পারে অনেকক্ষণ ধরে।

কিন্তু গৌতমের দিক থেকেই বা ব্যাকুলতা কই?

গৌতম কি ওই তরুণীর লাবণ্য আর কিশোরীর চাপল্যে মোড়া ক্ষীণাঙ্গী যুবতীকে 'মা' বলে ভাবতে পারে? পারে না।

তাই গৌতমের চিত্তেও 'মা' বলে ব্যাকুলতার সুর বাজে না। মামার বাড়ির মামী মাসিদেরই মতো একজন—এ ছাড়া আর কোনো অনুভূতি নেই তার মা সম্পর্কে!

মা ডেকে পাঠালে মাঝে মাঝে আসে গৌতম। বাড়ির ড্রাই-ভারকে দিয়ে ডেকে পাঠায় সুমিতা। অথবা বুলবুলি পাখি। কিন্তু আশ্চর্য, একদিনও তাকে খাওয়াতে পারে না এরা।

এ বাড়িতে এলে কোনোদিনই খিদে থাকে না গৌতমের।

সুমিতা কড়া গলায় বলে, 'কী, এখনো সেই বোষ্টমের খাওয়া চলছে বুঝি?'

গৌতম বলে, 'তা কেন? টাইফয়েডের পর থেকে তো সবই খাই, মাছ মাংস ডিম। সাধন রেঁধে দেয়।'

'ও বাবা, এতো উন্নতি! শুনে বাঁচলাম।'

সুমিতা ভুরু কোঁচকায়, 'তাহলে আর এখানে খেতে বাধা কি?'

'বাধা তো বলিনি। খিদে নেই তাই বলেছি।'

'এখানে যেদিনই আসিস—' বুলবুলি পাখি কাতর মুখে বলে, 'তোর খিদে থাকে না কেন, গৌতম ভাই ?'

'এমনি।'

'তা কেন ?' সুমিতা কুটিল গলা করে বলে, 'আমরা ওকে বিষ খাওয়াবো সেই ভয়ে !'

গৌতম মায়ের এ কথার উত্তর দেয় না, গৌতম মামাতো ভাইদের সঙ্গে ক্যারম খেলতে বসে যায়।

কিন্তু আর কি আসছে গৌতম ?

কতোদিন যেন আর আসেনি।

সুমিতা মনে মনে নিজের দিকে যুক্তি খাড়া করে, ঠিক আছে ! আমিই বা কেন তবে ছেলে ছেলে করে মরতে থাকি ?

দৈবক্রমে ওকে আমার গর্ভে জন্মাতে হয়েছিল এইমাত্র। যখন তেজপুরে থেকেছি, ও তো ওর বাপকেই ভজেছে। সবটা প্রাণ বাপের ওপর। বুঝতে পারতাম না ? আর তারপর তো আমাকে কাঠগড়াতেই বসিয়ে রেখেছে। যেন আমিই ওর বাপকে গুলি করেছিলাম। যাক গে, ওসব-কথা আর ভাবতে চাই না। সেই অতীতটাকে মুছে ফেলতে চাই আমি, আমার জীবন থেকে। আমি সুমিতা নামের সেই মেয়েটা, যে মেয়েটা কলেজ যেতো, গান গাইতো, কলেজ সোশ্যালে অভিনয় করে বাহবা পেতো, খেলাধুলোয় প্রত্যেকবার প্রথম হতো।

সেই পুরনো জায়গায় পুরনো আমি, পুরনো জীবনের মধ্যে আবার সুন্দর হয়ে ফুটে থাকতে চাই। ব্যস। কী দরকার আমার ওই এক অনমনীয় বংশের অনমনীয় বংশধরকে খোসামোদ করে আপন করার চেষ্টায়।

এই সবই ছিল যুক্তি সুমিতার।

কিন্তু ক্রমশই যেন তার মনের সুর পালটাচ্ছে। অতএব যুক্তির সুরও।

ক্রমশঃ আর পুরনো জায়গায় পুরনো জীবনে, কুমারীর সৌন্দর্য নিয়ে ফুটে থাকায় সুখ পাচ্ছে না সে।

এখন অন্য এক নতুন জায়গায়, নতুন জীবনের মধ্যে, নতুন হয়ে ফুটে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে সুমিতার।

আর সেই জীবন ওর হাতের মুঠোয় এসে গেছে।

রবির বন্ধু এখন আর কেবলমাত্র রবিরই বন্ধু নেই, অনেক বড়ো বন্ধু হয়ে উঠতে চাইছে রবির বোনের।

চটি বদলে পরে হাওয়ার মতো ভেসে গিয়ে গাড়িতে উঠলো সুমিতা। গদিতে পিঠ দিয়ে বসে পড়ে বললো, 'বাবাঃ, হাঁপিয়ে গেছি। যা ছুটে গেছি, এসেছি।'

'সাধ করে এই কষ্টটা বরণ করলে,' মজুমদার বাঁ হাত বাড়িয়ে পার্শ্ববর্তিনীকে একটু ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে টেনে এনে বলে, 'সাধ করে কষ্ট বরণ করলে। এতো মূল্যবান সময়টুকু তুচ্ছ চটির জন্যে খানিকটা বাজে খরচ হলো।'

মজুমদার নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিল।

মজুমদার তার সান্ধ্যভ্রমণের সময়টায় ড্রাইভারকে সঙ্গে রাখে না। মজুমদার চায় না তার নিত্য গতিবিধির রেকর্ড কারো খাতায় থাকে।

মজুমদার মাঝে মাঝেই এবাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের প্রমোদ ভ্রমণে বার করে নিয়ে যায়। হয়তো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে, নয়তো কোনো কার্নিভালে। একশো বেলুন কিনে ওড়াতে দেয় তাদের, আইসক্রীম খাওয়ায়, টফি খাওয়ায়, চানাচুর খাওয়ায়। আর তাদের ম্যানেজ করতে তাদের পিসিকে সঙ্গে নেয়। বলে, 'চলুন, চলুন, আপনিও চলুন। নইলে কায়দায় রাখতে পারবো না।'

চারটে বাচ্চার মধ্যে তিনটেই রবির, একটা ববির। ববির বৌ সেটাকে চোখ রাঙিয়ে আটকাতে চেষ্টা করে, পেরে ওঠে না। আর

রবির বৌ তো এগিয়েই দেয়। স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে ছেলেরা বেড়াতে যাবে, এর থেকে সুন্দর দৃশ্য আর কী আছে! বাড়িতে থাকা পিসি সঙ্গে যাবে, সেটাই বা কী এমন কুদৃশ্য ?

কিন্তু ক্রমশ শুধু ওই পিসিটাই যাচ্ছে। তার কারণ, যাওয়াটা ঘড়ির কাঁটার এমন একটা খাঁজে এসে পৌছোচ্ছে যে, প্রায়ই সেটা হয়ে যাচ্ছে ছোটদের আহার নিদ্রার সময়।

অতএব 'ওরা আর এখন না-ই বেরোল।'

মজুমদার একহাতে পার্শ্ববর্তিনীকে বেষ্টন করে অন্যহাতে আস্তে গাড়ি চালাচ্ছিল। কারণ এই অপার্থিব সুখটুকু তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করবার বস্তু।

কতোদিন থেকে যেন জীবনটা তার স্রেফ মরুভূমি হয়ে বসে আছে। রস নেই, রং নেই, মাধুর্য নেই। শুধু টাকা উপার্জনের যন্ত্র হয়ে বেঁচে থেকে কী লাভ, যদি সে টাকায় সুখ কেনা না যায়!

সুখ কোনোদিন কেনা হয়নি মজুমদারের। স্ত্রী একটা ছিল, তা সে ছিল প্রায় জন্মরুগ্ন। চিরদিন তার জন্যে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ভোগ করেছে, আর ডাক্তারের খরচা জুগিয়েছে। তারপর তো মরেই গেল।

মজুমদার যদি সেরকম বেপরোয়া হতো, এতোদিনে চরিত্র খারাপ করতে পারতো, বেপরোয়া ড্রিঙ্ক করতে পারতো, অসামাজিক জীবন যাপন করতে পারতো। কিন্তু মজুমদার বেপরোয়া নয়। মজুমদার জীবন-লুব্ধ।

মজুমদার এখনো একটি সংসারের স্বপ্ন দেখে।

যে সংসার একটি স্বাস্থ্যোজ্জ্বল গৃহিণীর উপস্থিতিতে স্বর্গোদ্যানতুল্য হবে। মজুমদার গাড়ি চালাতে চালাতে একটি পার্শ্ববর্তিনীর অভাবে গভীর শূন্যতা বোধ করে, মজুমদার এই জগতের বহুবিধ রমণীয় প্রসাধনের দোকানের সামনে দিয়ে যেতে যেতে নিজেকে পরমবঞ্চিত মনে করে।

মজুমদারের একটা মেয়ে আছে বটে, কিন্তু সেটা না থাকাই।

একবগ্‌গা গাঁইয়া মতো। সাজগোজের ধার ধারে না, বাপের সঙ্গে সম্পর্কই নেই যেন।

কেন ওর ওরকম অসহযোগিতা, বুঝতে পারে মজুমদার। বাপ হয়েছে বলে তার যেন 'জীবন' বলে আর কিছু থাকবে না। স্রেফ স্নেহশীল পিতার মূর্তিতে বুড়োর ভূমিকা পালন করে যেতে হবে। চুলোয় যাক।

মজুমদারের এখন ওই 'চুলোয় যাক' মনোভাব। চুলোয় যাক লোকনিন্দা, চুলোয় যাক সভ্যতা ভব্যতা। আনন্দ পাবার অধিকার সবাইয়েরই আছে।

'আমার এক জ্বালা হয়েছে—' খিলখিলিয়ে হেসে বলে ওঠে সুমিতা, 'লোকের সামনে 'আপনি', লোকের আড়ালে 'তুমি'। আচ্ছা এক দ্বৈত ভূমিকার মধ্যে পাক খাচ্ছি।'

মজুমদার গদ্‌গদ কণ্ঠে বলে, 'আর কেন এই কষ্টের মধ্যে থাকা? আমিও তো আর পারছি না।'

সুমিতাও হঠাৎ নিজেকে এলিয়ে দিয়ে বাঞ্ছিত প্রেমিক পুরুষের কাঁধে মাথা রেখে বলে, 'আমিও আর পারছি না মজুমদার! সকলের চোখেই যেন অভিযোগের চাহনি। সকলের কথার সুরেই অবজ্ঞার আভাস। যেন আমি একটা কাঠগড়ার আসামী! কেন, কেন আমি এভাবে প'ড়ে থাকবো?'

মজুমদার খাড়া হয়ে বসে। বলে, 'আমি তো অনেকদিন থেকেই আবেদন দিয়ে রেখেছি সুমিতা, তুমিই আমায় ঠেকিয়ে রেখেছো।'

'আর রাখবো না।'

সুমিতা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে, 'কিসের অপরাধে চোরের ভূমিকায় কাটাতে হবে আমায়? আমি যদি আমার হাহাকার করা শূন্য মনের জন্যে এতোটুকু সুখ আহরণ করতে যাই, সেটা করতে হবে চুরি করে। আর সেটুকু ধরা পড়ে গেলে চোরের লজ্জা নিয়ে থাকতে হবে। লোকের সামনে দেখাই, ওসব গায়ে মাখছি না, কিন্তু গায়ে বেঁধে মজুমদার, ছুঁচের মতো বেঁধে। তুমি একটু

ভালবাসো বলে সকলের বিষদৃষ্টিতে পড়ে আছি। মা পর্যন্ত—'

কান্নাটা আর একটু উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে সুমিতার।

এটা কি অভিনয়?

কেন তা হবে?

সুমিতার চিত্তভঙ্গীর দিক থেকে এই অনুভূতি তো তাকে দগ্ধাচ্ছে। চির প্রশ্রয়দাত্রী মা পর্যন্ত যে আজকাল বিমুখ, তা কি টের পায় না সে?

অথচ তার জন্যে এক আনন্দের জগৎ, ভোগের জগৎ প্রতীক্ষার প্রহর গুনছে। কিসের জন্যে সে-জগতের আহ্বানকে ফিরিয়ে দেবে সুমিতা? মা একটু প্রসন্ন হবে বলে? বৌদিরা একটু করুণা করবে বলে? দাদারা দৈবাৎ একদিন ডেকে কথা কইবে বলে? শুধু তো এইটুকু? আর কি?

ক্রমে সবাই সুমিতা নামের মেয়েটাকে ভুলে যাবে। নিজেদের উত্তাল জীবনের মাঝখানে সুমিতাকে কোনোদিন ডেকে আনবে না। আস্তে আস্তে ফুরিয়ে যাবে সুমিতা।

আর সেই একটা দিক?

সেখানেই বা সুমিতার কোন্ পদমর্যাদা?

সেই কঠোর বৃদ্ধ তো অকারণেই সুমিতাকে অশুচি, অপবিত্র, চরিত্রহীনার দলে রেখে দিয়েছেন।

সুমিতা কি সেটা বুঝতে পারে না?

দূরে থেকেও সেটুকু বোঝবার ক্ষমতা আছে সুমিতার।

কারণ, সুমিতা ঝিয়ের বেশভূষায় না থেকে, মানুষের বেশভূষায় থাকে। কারণ সুমিতা আহার-পাত্রে আমিষের আস্বাদ নেয়। অতএব সুমিতা পতিত। তা পতিতই যদি, তো ভালো করেই পতিত হোক।

গৌতম? গৌতমই কি আমায় 'মা' বলে সম্মান করে?

হঠাৎ তপ্ত একঝলক জল চোখে উপছে ওঠে সুমিতার।

মজুমদার আত্মহারা হয়।

মজুমদার সীমারেখাব রেখা পার হয়ে যায়।

বুদ্ধ মন্দিরের চত্বর থেকে বেরিয়ে এসে গৌতম যখন রাস্তায় পা ফেললো, মাথার মধ্যে ওর তখন প্রবল একটা দাহ।

যে দাহটাকে ভাষা দিলে এই দাঁড়ায়—

'ও এতোদিন একটা মতলব নিয়ে আমার সঙ্গে মিশেছে। ও এতোদিন আমাকে ওব একটা ইচ্ছাপূরণের যন্ত্র হিসেবে দেখেছে।'

উঃ।

এইজন্যেই জগৎ চিরদিন মেয়েদেরকে সন্দেহের আর অবজ্ঞাব দৃষ্টিতে দেখে থাকে।

বিশেষ কোনো মেয়ের জন্যে হয়তো সম্ভ্রম আছে পৃথিবীর, কিন্তু সমগ্র নারীজাতির জন্যে নয়। আর তার কারণ ওই টুনুর মতো মেয়ে।

টুনুর টাকার অঙ্ক শুনে তখন নিজেকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ভেবে যে দাহটা চিড়বিড়িয়ে উঠেছিল, সেইটাই ক্রমশ দাউ দাউ জ্বলতে শুরু করে নিজেকে প্রতারিত ভেবে।

ও আমাকে ঠকিয়েছে।

ও আমায় বুদ্ধু ভেবে মনে মনে কতো হেসেছে। এখন বুঝতে পারছি আমাকে ডেকে ডেকে ওর বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার কারণ কি। আর কিছুই নয়, নিজের ঐশ্বর্য দেখানো। শুধু নিচতলায় অতিথির ঘরে বসিয়েই আশা মেটেনি, ওর মরা মায়ের ছবি দেখাবার ছুতো করে আমায় দোতলায় তিনতলায় ডেকে নিয়ে গেছে।

কই, আমার তো কোনোদিন ইচ্ছে হয়নি টুনুকে আমার বাবার ছবি দেখাই? তার মানে, ইচ্ছেটা স্বাভাবিক নয়।

অথচ কী অপূর্ব দেখাচ্ছিল তখন ওকে। 'এই যে আমার মা—' বলে যখন আমার দিকে তাকিয়ে ছিল তখন ওর চোখ

ছুটো জলে টলটল করে উঠেছিল। হাসি হাসি মুখের সঙ্গে ওই জলটায় কী পবিত্র একটা সৌন্দর্য ফুটে উঠেছিল ওর রোগা রোগা মুখে।

কী মন কেমন করছিল তখন আমার দেখে!

ঠিক তখুনি বাবার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল আমার।

অথচ ও তখন একটা অভিসন্ধি নিয়ে অভিনয় করছিল।

তার মানে, ও একটি পাকা অভিনেত্রী।

নিজের মনে যুক্তি সাজিয়ে সাজিয়ে ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে গৌতম।

যখন ও ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ছেড়ে বহু কাঠখড় পুড়িয়ে যাদবপুরে চলে এসেছিল, তখনই আমার সন্দেহ করা উচিত ছিল, এটা স্বাভাবিক নয়।

আমি সন্দেহ করলাম না। ও যা বোঝালো আমি তাই বুঝলাম। একটা মেয়ে আমাকে ভালবেসে, বাড়ির লোককে চটিয়ে, এতো ঝামেলা পুইয়ে আমার কাছে চলে এসেছে ভেবে আহ্লাদে মরে গেলাম।

অথচ শ্রীমতী টুনু তখন এই ভেবে আহ্লাদে অধীর হচ্ছেন, খেলার ঘুঁটিটা পাকিয়ে আনছি।

হয়তো চিন্তার ভাগটা ঠিক এতো স্পষ্ট হচ্ছিল না গৌতমের। তবে ধূমবাষ্পটা এই বাতাসের গতিতেই টলছিল।

আর এতোদিন ধরে এতো বোকা বনে থাকার বদলে কী শিক্ষা দেওয়া যায় টুনুকে, সেই চিন্তা খেলছিল।

হঠাৎ পিছন থেকে কাঁধে একটা হাত পড়লো।

গৌতম চমকে উঠলো।

বেহায়া মেয়েটা আবার এসেছে বুঝি। চড়াৎ করে ঘাড় ফেরালো। ফেরালো, আর সঙ্গে সঙ্গে অপরাধী হেসে উঠলো, 'কি রে, চোখে অমন আগুন কেন? ভস্ম করবি নাকি?'

প্রসেনজিৎ।

গৌতমের স্কুলের বন্ধু। যদিও বয়সে একটু বড়, কিন্তু একই পাড়ায় ছিল। ঢাকুবিয়ারই ছেলে, এখন ওর বাবা দমদমের দিকে বাড়ি করে চলে গেছেন। নিজেও প্রসেনজিৎ খড়্গাপুরে পড়তে চলে গেছে।

অনেক দিন পরে দেখা হলো।

কিন্তু গৌতম তখনও বিচলিত, তাই গৌতমের মুখে উচ্ছ্বাস ফোটে না। গৌতম কিছু একটা বলতে যায়, তার আগেই প্রসেনজিৎ বলে ওঠে, 'কী ব্যাপার! মনে হচ্ছে যেন ভূত দেখলি। এদিকে তোদের বাড়িতে গিয়ে তাজ্জব। তুই নাকি আজকাল রাত দশটার আগে বাড়ি ফিরিস না, দাদু পিসিকে গ্রাহ্য করিস না। এতোখানি উন্নতি কবে থেকে হলো রে?'

এতোক্ষণে গৌতম কথা বলে।

'বাড়ি গিয়েছিলি?'

'গিয়েছিলাম তো! তোর পিসির হাতের সুজির পায়েস আর রসবড়া খেয়ে, তাঁর সঙ্গে এক ঘণ্টা ধরে গল্প করে, তোর আশায় হতাশ হয়ে চলে যাচ্ছিলাম।'

'পিসি বললো আমি রাত দশটার আগে বাড়ি ফিরি না?'

'বলেছে। কিন্তু ভুল তো বলেনি। হাতে হাতেই তো প্রমাণ পাওয়া গেল। কি ব্যাপার রে, সত্যি?'

'ব্যাপার আবার কি?' গৌতম গম্ভীর গলায় বলে, 'চিরদিনই মানুষ খোকা থাকে না।'

'ধারণা ছিল, তুই চিরদিনই তাই থাকবি!'

'ধারণাটা অবাস্তব।'

'বা-বাঃ, কী কাটা-কাটা বোল ছাড়ছিস।'

প্রসেনজিৎ ওর কাঁধে একটা থাবড়া মেরে বলে, 'তোকে দেখে কি মনে হচ্ছে জানিস? হয় ব্যাঙ্ক ফেল্ হয়ে সর্বহারা হয়ে সংসার ত্যাগ করতে যাচ্ছিস, নয়—এইমাত্র বৌকে পুড়িয়ে শ্মশান থেকে ফিরছিস।'

'হুঁ !'

গৌতম ভিতরের দাহ চাপা দিয়ে বলে, 'তুমিও কিছু কম কথা শেখোনি। তা এখন যাচ্ছিস কোথায় ? দমদমে ফিরছিস ?'

'না, আজ ঢাকুরেতেই থাকবো। কাকার বাড়ি নেমন্তন্ন।' প্রসেনজিৎ একটু হাসে, 'তখন কাকা বাবাকে তিষ্ঠোতে দেয়নি, আমাদের সঙ্গে কী না ব্যবহার করেছে, এখন খুব আদর।'

এখন খুব আদর ! দুর্ব্যবহারের পর আদর !

গৌতম কড়া গলায় বলে ওঠে, 'আর সেই আদব নিচ্ছিস তুই ?'

'তা কি করা যাবে !' প্রসেনজিৎ উদার হাস্যে বলে, 'আপনার লোককে তো ত্যাগ করা যায় না। যতোই হোক বাবার ভাই। তাছাড়া যখন দুর্ব্যবহার করেছে, তখন যদি রাগ করেছি তো, এখন ভালো ব্যবহার করলে হাস্যবদনে নেবো না কেন ?'

গৌতম যেন অকারণ উত্তেজিত হয়। গৌতম ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'মানুষের মনটা তো অঙ্কশাস্ত্র নয় প্রসেন, তার একটা অনুভূতি আছে।'

'থাকলেই বা ! 'ইহাই পৃথিবী', বলে একটু দার্শনিকের হাসি হেসে সব উড়িয়ে দেওয়াই শান্তির।'

'এই ক'বছরেই তোর অনেক জ্ঞান জন্মে গেছে দেখছি।'

গৌতম কাঁধটাকে নাচায়।

'আর তোর ব্রহ্মজ্ঞান।'

প্রসেনজিৎ হা হা করে হেসে ওঠে। তারপর বলে, 'আচ্ছা কাল আবার আসছি, সকালটা আছি।'

গৌতম বন্ধুকে আর একটু ধরে রাখতে আঁকুপাকু করে না, শুধু হঠাৎ বলে বসে, 'তোর বয়েস কতো রে প্রসেন ?'

'বয়েস ? হঠাৎ এ প্রশ্ন ? চাকরী-টাকরী আছে নাকি সন্ধানে ?'

'আছে।' গৌতম একটু রহস্যময় হাসি হেসে বলে, 'ভালো চাকরী ! মোটা মাইনে, খাটুনির বালাই নেই, শুধু 'বস'-এর একটু

বশংবদ হওয়া।···বল না বয়েস কতো?'

প্রসেনজিৎ হেসে ফেলে, বলে, 'সঠিক বয়েসটা হচ্ছে বাইশ, কিন্তু যে রকম লোভনীয় চাকরীর আশা দিচ্ছিস, তাতে আঠারোয় ফিরে যেতেও রাজী আছি, আটাশে উঠতেও আপত্তি নেই। যেটা দরকার বলে দে।'

'হ্যাঁ! চাকরীই! না, কোনো কিছু হতে হবে না, যা আছিস তাতেই চলবে। কাল আয়, বলবো সব।'

'আরে বাবা ধোঁকায় রাখছিস কেন? বলেই ফেল না। সত্যি চাকরী না আর কিছু!'

'বললাম তো কাল বলবো।'

'ঠিক আছে। বুঝতেই পারছি, স্রেফ ধাপ্পা। আচ্ছা···'

'আচ্ছা।'

প্রসেনজিতের চলে যাওয়ার দিকে কেমন একটা প্রতিহিংসা-প্রতিহিংসা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে গৌতম।

কিন্তু প্রসেনজিৎ নিশ্চয়ই তার লক্ষ্য নয়। নিরীহ বাল্যবন্ধু।

ওই দৃষ্টিটা সেই অপরাধিনীর উদ্দেশে।···যে আজ গৌতমকে স্বর্গ থেকে আছড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে মর্ত্য-ধুলোয়।

অথচ সেই অপরাধিনী তখন কোনোমতে একটা ট্যাক্সি ধরে বাড়ি ফিরে গিয়ে বিছানায় পড়ে কেঁদে ভাসছে।

গৌতম যে এতো নির্মম হতে পারে এটা কী স্বপ্নেও কোনোদিন ভেবেছে টুনু?

শুধুই কি নির্মম? কুটিল নয়?

কুটিল না হলে কী করে ভাবতে পারলো সে, টুনু টাকাটা .ধি ায়ত্ত করতে—

সংসা.. আর ভাবতে পারে না। কেঁদে কেঁদে সর্দি হয়ে যায় টুনুর। থেকে।

প্রসেনজিৎ হা হা করে হেসে ওঠে, 'তুমি একটি পাগল! তোমার বদলে আমাকে বিয়ে করতে চাইবে সে?'

গৌতম গম্ভীর হিংস্র গলায় বলে, 'কেন চাইবে না? তার তো দরকার একটা পাত্র, যাতে সে—'

'তা হলে আমিই বা কেন? অজস্র পাত্র আছে জগতে। বিশেষ করে ধনবতী কন্যের জন্যে। একটি বিজ্ঞাপন ঝাড়লেই ঝাঁকে ঝাঁকে এসে ছেঁকে ধরবে।'

'তা জানি! তবু—' গৌতমের রাগে শিরা ফুলে ওঠে। গৌতম চড়া গলায় বলে, 'হঠাৎ এই মুহূর্তে তোকে দেখে মনে হলো, এরকম একটা লাভের ব্যাপার, যে কেউ এসে লুঠে নেবে, তুই বা নয় কেন?'

প্রসেনজিৎ বলে, 'আমার মনে হয়, তুই কোথাও একটু ভুল করছিস।'

'কোথাও কোনো ভুল নেই', গৌতম কটু গলায় বলে, 'জলের মতো পরিষ্কার। বললাম তো সবই। বিয়ে না করলে টাকাটি হাতে পাচ্ছে না, অথচ বাপের চাড় নেই মেয়ের বিয়ে দেবার। তাই সাবালিকা হওয়া মাত্রই উঠে পড়ে লেগে গেছে।'

প্রসেনজিৎ হতাশ গলায় বলে, 'জানি না বাবা! বরাবর জানি মেয়েগুলো একটু মহৎ আর নির্বোধ হয়, তারাও যদি এরকম মতলববাজ হয়ে ওঠে—'

'মেয়েগুলো মহৎও নয়, নির্বোধও নয়, ওরাই হচ্ছে সব থেকে বিচ্ছিরি—' গৌতম বলে, 'আমি ওদের চিনে ফেলেছি। জাতটাই বাজে।'

প্রসেনজিৎ আহত গলায় বলে, 'ওভাবে বলতে হয় না গৌতম! মেয়েদের মধ্যে আমাদের মা আছেন।'

গৌতম প্রসেনজিতের দিকে তাকায়।

প্রসেনজিতের মুখে চোখে পরিচ্ছন্ন একটি শ্রদ্ধা আর সারল্য। যেন যেখানে মা আছেন, সেখানে আর কোনো কথা পৌঁছতে

পারে না। বিরূপতার নয়, নিন্দার নয়, সমালোচনাব নয়।

কারণ প্রসেনজিতের সত্যকার মা আছেন।

সত্য ধ্রুব, অচঞ্চল নিশ্চিত।

প্রসেনজিৎকে স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে উঠে শূন্যতার গহ্বরে পা ফেলে শিউরে উঠতে হয় না।

একটু আগেই প্রসেনজিৎ বলেছে, 'একটু পরেই দমদমে চলে যাচ্ছি। আর দু'দিন মাত্র আছি, মা'র কাছে না খেয়ে যদি এখানে-ওখানে খেয়ে বেড়াই, মা আস্ত রাখবে না।'

মা আস্ত রাখবে না!

অবলীলায় বললো কথাটা প্রসেনজিৎ।

যেন পকেট থেকে পাঁচটা খুচবো কাগজের সঙ্গে ব্যাঙ্কের পাশ বইটাও বার করে টেবিলে ফেলে রাখলো। যে পাশ বইটায় ওর সম্পত্তির প্রমাণপত্র রয়েছে।

গৌতম কি তাহলে প্রসেনজিৎকেও ঈর্ষা করবে? যেমন করেছিল টুনুকে। না কি গৌতম নিজের অকিঞ্চিৎকরতায় মাথা হেঁট করবে?

গৌতম মাথাই হেঁট করলো।

আপন মন্তব্যের লজ্জায় নয়। আপন ভাঁড়ারের শূন্যতায়।

প্রসেনজিৎ বললো, 'আমি বলছি তুই একবার যা মেয়েটাব কা: ।'

'আমি? অসম্ভব। এই ঠিকানা দিচ্ছি, তুমিই চলে যাও। দেখবে তুমি যদি কালই বিয়ে করতে রাজী থাকো, ও কালই বিয়ে করে ফেলবে। জানিস, ও আমার বয়সের ঘাটতির জন্যে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারকে ঘুষ দেবার প্রস্তাব করছিল।'

'তাই নাকি? তাহলে কী তোর থেকে বয়সে বড়?'

'সে যৎসামান্য।'

'ওই যৎসামান্যই আমাদের চোখে অসামান্য। বাঙালী গেরস্ত ঘরের ছেলে, জানি ছাঁদনাতলায় দাঁড়িয়ে 'বর বড় না কনে বড়'

বলে সবাই মিলে ধরে-টরে কনেটাকে উঁচু করে 'বড় বড়' খেলা করতে হয়। তা নয়, কোথাকার কোন এক চুনবালি খসা ভ্যাপসা দেওয়াল ঘরে, পচা টেবিলের ধারে বসে নিজের থেকে বয়সে বড় একটা মেয়ের সঙ্গে একসঙ্গে একটা শুকনো কাগজে সই করে বললাম, এবার চলো আমরা একটা হোটেলে ঘর খুঁজে বাসর করিগে। ছিঃ। এ আবার বিয়ে নাকি ?'

গৌতম প্রতিবাদের সুরে বলে, 'তা যে হতভাগ্যদের ছাঁদনাতলা পাতবার অথবা বাসর সাজিয়ে দেবার লোক নেই, তারা কী করবে ?'

'তারা ? তারা ওই 'মধুর অভাবে গুড়' নাকি বলে, তাই করবে আর কি।...কথাটা মা যখন-তখন বলে, বুঝলি ? আগে মানে বুঝতাম না, এখন বেশ বুঝি। শিবপুরে চান্স না পেয়ে যখন খড়্গপুরে চলে যেতে হলো, মনে হলো—'

প্রসেনজিতের কথার ধরনটা বরাবরই এই রকম, যখন-তখন মা কি বলে—তার উদাহরণ দেয়।

ছেলেবেলা থেকেই প্রসেনজিতের এটা অভ্যাস। কিন্তু এখন গৌতমের মনে হলো ও যেন ইচ্ছে করে মা'র কথা তুলছে।

তার মানে নিজের ঐশ্বর্য মেলে ধরে দেখাচ্ছে। গৌতমের রাগ এসে গেল।

গৌতম গম্ভীরভাবে পকেট থেকে একটা নোটবই বার করে তার একটা পাতা ছিঁড়ে ওর হাতে দিল।

গৌতম ইচ্ছে করলেই ওটা টুকে দিতে পারতো, তবু ছিঁড়েই দিল। যেন নিজের বুক পকেট থেকে নয়, বুক থেকেই টুনু নামের ঘুঘু মেয়েটার ঠিকানাটা ছিঁড়ে ফেলে দিল।

'কী এটা ?' বললে প্রসেনজিৎ।

'ঠিকানাটা। যেখানে পাত্র চাই।'

'দূর ! ও আমি নিয়ে কি করবো ?' বলে প্রসেনজিৎ কাগজটার দিকে তাকিয়ে দেখে বলে, 'আরে এ তো দেখছি আমার

ছোটোমাসিব বাড়ির পাড়ায়। ছোটোমাসির সঙ্গে একবার দেখা না করে গেলে মা রসাতল করবে।…তবে দে, তোব সেই মহিলাটিকে একবার দেখেই আসি। দেখলে বুঝতে পারবো তোব ধারণা ভুল না ঠিক।'

'একদিন দেখলেই চিনে ফেলতে পারবি? নিজের প্রতি এতো আস্থা?' গৌতম তীব্র গলায় বলে, 'আমি তিন বছর ধবে দেখছিলাম—'

'তুমি অন্ধ চোখে দেখছিলে—' বলে নোটবুকের ছেঁড়া পাতাটুকু সাবধানে ভাঁজ করে সযত্নে পকেটে পুরে প্রসেনজিৎ বলে, 'আচ্ছা চলি।'

তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে এগোয়।

প্রসেনজিতের ওই স্বভাব, সব কিছুতেই যত্ন, সাবধানতা, পবিপাটি। কিন্তু গৌতমের এখন হঠাৎ ওইটা দেখে খুব হাসি পেলো। ওঃ, তবে নাকি তুমি উড়িয়ে দিচ্ছিলে! তবে নাকি তোমার লোভ নেই! এই তো বাবা, ঠিকানাটি পেলে, আব দরকারী দলিলের মতো সাবধানে—

প্রসেনজিতের ওপব খুব একটা আক্রোশ আসে গৌতমের। ইচ্ছে হয ছুটে ওর পিছন পিছন গিয়ে শার্টের কলার চেপে ধরে ওই কাগজটা কেড়ে নিয়ে বলে, 'খুব যে উদারতা দেখাচ্ছিলি রে শূয়ার!… আমি নিয়ে কী করবো? আর যেই পেলি, চিলের মতো ছোঁ দিয়ে নিয়ে নিলি! খবরদার বলছি সেই রাস্তার মুখো হবি না তুই। এই ছিঁড়ে ফেলে দিলাম তোর সামনে। এবার কী করে যাস দেখি? নাকি ইতিমধ্যেই মুখস্থ করে ফেলেছিস? তা তুই পারিস। তুইও একটি ঘুঘু।'

হঠাৎ চটিটা পায়ে দিয়ে প্রসেনজিতের কাকার বাড়ির দিকে এগোতে থাকে গৌতম। বাড়িটা চেনা।

ওদের সেই পুরনো বাড়িটারই তো একাংশ।

প্রসেনজিতের খুড়তুতো বোন বলে, 'ওমা! এই মাত্র তো চলে গেল মেজদা। তাড়াতাড়ি গেলে বাস স্ট্যাণ্ডে ধরতে পারবেন। আপনাদের বাড়িতেই তো গিয়েছিল সকালে···ওকি, অমন করে ছুটছেন কেন? বাস তো কতো দেরী করে আসে।'

হি হি করে পিছনে হাসতে থাকে ফ্রক-পরা বেড়া-বিনুনি বাঁধা মেয়েটা। সময় হাতে থাকলে ঠাশ করে বড় একটা চড় ওর গালে বসিয়ে আসতো গৌতম।

কিন্তু এতো ছুটেও কিছু হলো না।

হয়তো দেরী করেই আসে বাস, কিন্তু সেই দেরী-শেষেব মহামুহূর্তটিই প্রসেনজিতের ভোগে এসে গেছে। গৌতম দেখলো, মোড়ের ওখানে একটা বাস ঘুরে চলে গেল। তার মানে গৌতমের বিশ্বাসঘাতক বন্ধুটাকে বুকে করে নিয়ে গেল। যে পাজীটা গৌতমের একটু অসতর্কতার সুযোগে গৌতমের সবকিছু চুরি করে নিয়ে পালাতে চায়।

গৌতম যদি এখনো পর্যন্ত তার মা-বাপের সঙ্গে সেই তেজপুরের বাড়িতে থাকতো, গৌতম হয়তো বালকই থেকে যেতো। কিন্তু গৌতম তা থাকতে পায়নি। গৌতমের বিধাতা তাকে খোলা মাঠে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। গৌতমের মন কেবল গভীরে শিকড় নামিয়েছে। তাই গৌতম কুড়ি বছর বয়সেই অনেক বড় হয়ে গেছে।

গৌতম প্রেম, প্রতিহিংসা, ঘৃণা, অবিশ্বাস সবকিছুর মানে শিখে ফেলেছে।

গৌতম অতএব ভেবে অস্থির হয়ে যাচ্ছে, লোভী প্রসেনজিৎটা তার লোভার্ত হাত দুটো দিয়ে টুনুদের বাড়ির সেই ভারী লোহার গেটটা ঠেলে ঢুকছে।

তারপর ওই হাত দুটো টুনুকে বাড়িয়ে নেবে। আর নির্বোধ গৌতমের আহাম্মুকির কথা ভেবে মনে মনে হাসবে।···নিশ্চয়ই

হতভাগাটা নিজের পরিচয় দেবার জন্যে গৌতমের নাম করবে। বলবে, 'গৌতম আমায় পাঠিয়ে দিয়েছে। শুনলাম এখানে একটা ভেকেন্সি আছে—'

হ্যাঁ, এইভাবেই গুছিয়ে কায়দা করে পাড়বে কথাটা। চালাকের রাজা তো!

আমি নির্বোধ, আমি আহাম্মক! আমি মুখ্যু!

ক্রমশই প্রসেনজিৎকে সেই গেটটা দিয়ে ঢুকে এগোতে দেখতে পায় গৌতম।

বাগান থেকে ঘরে, ঘর থেকে সিঁড়িতে, সিঁড়ি থেকে দোতলায়।

প্রসেনজিতের কুকুরে ভয় নেই, তাই কুকুরটাকে আর বাঁধতে হচ্ছে না টুনুকে। টুনুর সঙ্গে কুকুরটাও ঘুরে বেড়াচ্ছে। টুনু টেবিলের ধারে এসে বলছে, 'এই দেখো আমার মা।'

'মা'র ছবি' বলে না টুনু, বলে, 'আমার মা।'

ওই ছবিটাও ওর কাছে মা'র মতই সত্য।

ছবির কথা ভাবতে টুনুর সেই জল টলটলে চোখটা মনে পড়ে যায় গৌতমের। টুনুর সেই হতাশ-উদাস কথাটা মনে পড়ে যায়, 'মা না থাকা যেন কিছুই না থাকা। স্বার্থপরের মতো মনে হয় কি জানো গৌতম, মা যদি চিরদিন বিছানাতেও পড়ে থাকতেন।'

হঠাৎ সারা শরীরে প্রবল একটা আলোড়ন ওঠে গৌতমের। হঠাৎ টুনুর জন্যে ভয়ানক মন কেমন করে যায়।

যেন টুনু নামের একটা পুতুলকে আক্রোশে আছড়ে ভেঙে ফেলে ভাঙা টুকরোগুলো আর একজনকে বিলিয়ে দিয়েছে গৌতম।

অথচ ভারী সুন্দর ছিল পুতুলটা।

আমি তার কথায় কান দিইনি।

আমি তাকে নিষ্ঠুরের মতো কথা বলেছি। আমি টুনুকে অমন কড়া কথা বললাম কি করে?

টুনু কেন মতলববাজ হবে?

টুনু শুধু নিজের মনের মতো জীবনের স্বপ্ন দেখছিল। স্বপ্ন

দেখবার সামর্থ্য টুনুর রয়েছে বলেই দেখছিল। এটা স্বাভাবিক। টুনুর অতো ব্যস্ততার কারণ, হয়তো ওর বাবা ওর জন্যে অন্যত্র পাত্র খুঁজছে, হয়তো বিয়ের ঠিক করে বসে আছে। তাই টুনু অমন পাগলের মতো···ঠিক ঠিক।

আশ্চর্য, এই সহজ সরল কথাটা বুঝতে না পেরে আমি—

ছি ছি। টুনু আমায় কতো নীচ, কতো ইতর ভাবলো!

এরপর আবার যখন প্রসেনজিৎ গিয়ে বলবে, 'গৌতম আমায় পাঠিয়ে দিয়েছে, বলেছে এখানে ভেকেন্সি আছে।'—তখন টুনু আরো কতো নীচ নিষ্ঠুর ভাববে গৌতমকে!

প্রসেনটা গিয়ে পড়বার আগেই আমায় ওর কাছে পৌঁছে যেতে হবে। ওর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে আমায়।

দেরী করলে প্রসেনটা গিয়ে পড়বে।

লোভের দৃষ্টিতে টুনুর দিকে তাকিয়ে টুনুকে অপবিত্র করে ফেলবে।

আমি এক্ষুনি চলে যাবো।

বলবো, 'টুনু, আমরা আর দিন গুনবো না, আমরা এখুনি দিনটা কিনে নেবো। সেই একটা দেওয়ালের বালি খসা ভ্যাপসা ঘরে ময়লা টেবিলের ধারে বসে চুক্তিপত্রে সই-করা বিয়ের ধার ধারবো না আমরা। আমাদের বিয়েতে শাঁখ বাজবে, কলাগাছ বসানো হবে, দুধের পাথর-টাথর সাজানো হবে।'

এ সব আমি করতে পারবো পিসিকে বলে। করবোই! বলবো, 'দেখো পিসি, কতো ভালো মেয়ে টুনু। ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মায়নি বলেই কি অবহেলা করবে তাকে? তার মা'র ছবি দেখবে চল তাহলে। দেবীর মতো মুখ।···টুনু কালো, হয়তো ওর বাবার মতো। দেখিনি ওর বাবাকে। কিন্তু সুন্দর বৌ কী দরকার তোমাদের? দাদু তো একদা এনেছিলেন সুন্দর বৌ, কী স্বর্গলাভ হয়েছে তাতে তোমাদের?

গৌতম একটা ট্যাক্সিতে চড়ে বসেছিল, গৌতমের পকেটে

আজ কলেজে মাইনে দেবার টাকা ছিল।

ট্যাক্সির গদিতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে এ সব ভাবছিলো গৌতম। গৌতম জানে, পিসি যতোই পিতৃভক্ত হোক, সে ভক্তি ভয়ের ভক্তি। সে ভক্তি ক্রীতদাসেব অন্ধ আনুগত্য। দাতুর ওই কঠোবতার সঙ্গে পিসিব হৃদয়ের যোগ নেই। পিসি গৌতমকে সমর্থন কববে। পিসি একটু শিথিল হতে পেলে বাঁচবে।

তাছাড়া এও জানে, সুন্দর বৌ না এনে কালো বৌ এনেই খুশি হবে পিসি। কারণ, ওঁবা তো সেদিন বুঝেই ফেলেছেন, ভাবলে গৌতম। তাই সব শুনলে অবাক হয়ে যাবেন না।

শুধু আমাকে সাহস করে বলতে হবে।

বলতে হবে, 'তোমরা আমাকে চাও, না তোমাদের আচাব-আচরণের খোলসটাকেই আঁকড়ে রাখতে চাও ?'

হয়ে যাবে। সব সোজা হয়ে যাবে।

শুধু যদি টুনু ইতিমধ্যে না কিছু করে বসে থাকে।

টুনু যা আবেগ-চালিত মেয়ে, ভয়ঙ্কর কিছু একটা করে বসাও আশ্চর্য নয়। গৌতম মাথাব চুলগুলো টেনে টেনে মাথায় ব্যথা ধরিয়ে ফেলে।

তা যদি হয়, নিজেকে আমি খুনী ছাড়া ভাবতে পারবো না।

যখন হঠাৎ টুনুকে মতলববাজ ঘুঘু মেয়ে বলে মনে হয়েছিল গৌতমের, তখন যেন গৌতমের ভালবাসার ঘরটায় ছিটকিনি পড়ে গিয়েছিল, হঠাৎই আবার খুলে গেল সে ঘর। গৌতম মুঠো মুঠো করে ভালবাসা বার করে ফেললো টুনুর জন্যে।

টুনুকে আমি কোনোদিন আদর করিনি, আজ করবো!

বীরের মতো প্রতিজ্ঞা করে ফেললো গৌতম। টুনু কতোদিন 'ভীরু' বলে হেসেছে। গৌতম সাহস সঞ্চয় করতে পারেনি।

হয়তো সেটাই দেবেন্দ্রনারায়ণের কঠোর নীতির একটু সার্থক ফল। সংস্কার শেকড় গেড়ে বসে আছে।

কিন্তু আজ গৌতম বড় একটা কিছু ত্যাগ করতে চায় টুনুর

জন্যে। তাই ওই সংস্কারটাই ত্যাগ করবে। সেই ত্যাগের বিরাটত্ব কম নয়।

গাড়ি থেকে নেমেই গেটের দিকে তাকালো গৌতম।

একটু আগেই কি কেউ এই গেট ঠেলে ঢুকে গেছে ঘরে? কোথাও কি তার জুতো জোড়াটা ছাড়া আছে?

কোথাও কিছু দেখতে পেল না গৌতম।

তবে আসেনি।

তবে এখনো টুনু আরও এক নতুন অপমানের জ্বালায় ছটফট করছে না। গৌতম গিয়ে বলতে পারবে, 'টুনু, সেদিন তোমায় বোকার মতো কতকগুলো যা-তা কথা বলেছি! তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো বিশ্রী রকমের একটা ভুল ধারণার বশেই অমন কাণ্ড করেছি। তুমি কিন্তু—'

খোকা চাকরটা গিয়ে খবর দিয়েছিল, বামুনদি নেমে এলো। বললো, 'ভালই হলো দাদাবাবু, আপনি এলেন। টুনু দিদি তো—'

'একটু আগে কেউ এসেছিল বামুনদি? আমার মতো বয়েস?'

'কই না তো?' বামুনদি মাথা নাড়ে, 'আমি তো বরং কাল থেকে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি আপনারা যদি কেউ এসে পড়েন। নইলে মেয়েটাকে তো ওঠাতেও পারছি না, খাওয়াতেও পারছি না। কী যে হয়েছে, কাল সন্ধ্যে থেকে সেই যে কান্না জুড়েছে, এখনো থামা নেই। কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছে।'

কেঁদে কেঁদে! টুনু কাল থেকে শুধু কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছে!

তার মানে গৌতম খুনীর থেকে কিছু কম নয়!

গৌতমের নীচতা, গৌতমের ক্ষুদ্রতা, গৌতমের নিষ্ঠুরতা দীর্ণ-বিদীর্ণ করে ফেলেছে টুনুকে। গৌতমের ইচ্ছে করল নিজেকে ধরে ওই পাথর-বাঁধানো উঠোনটায় আছাড় মারে।

তবু গৌতমকে নিজেকে সামলে নিতেই হয়। বলতেই হয়, 'কেন বলুন তো? কেউ মারা-টারা যাওয়ার খবর এসেছে না কি?'

অবোধ তো সাজতেই হবে।

বাইরের লোকেব সামনে তো প্রকাশিত হওয়া চলবে না। বলে ওঠা তো যাবে না, 'বামুনদি, টুনুর এই কষ্টের জন্যে আমিই দায়ী।'

অতএব অবোধ সাজা।

বামুনদি ওই সাজটাই দেখে। তাই অতিথিকে কোনো সন্দেহ করে না। বরং চুপি চুপি তার সামনে নিজের সন্দেহ ব্যক্ত করে

মাথা নেড়ে আস্তে আস্তে বলে, 'না, সে সব কিছু না। বোধ হয় বাপের কীর্তি টের পেয়েছে।'

ঠিক। ঠিক যা ভেবেছিল গৌতম।

জোর করে কোথাও বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলেছে বোধ হয় ওর বাবা। যাক, গৌতম তার আগেই একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলবে। গৌতম কিছু না পারে, টুনুকে নিয়ে গিয়ে পিসির হাতে ধরে দিয়ে বলবে, 'পিসি, আগে থেকেই এর ভার নাও। নইলে মেয়েটার দুঃখের শেষ থাকবে না।'

গৌতম মনে মনে রিহার্সাল দিচ্ছে।

কিন্তু বামুনদি তো থেমে যায়নি।

বামুনদি যে গলা আরো নামিয়ে বলে চলেছে, 'মনিব তিনি, আমরা মাইনে করা লোক, কিছু বলা শোভা পায় না, কিন্তু আমি বুড়ি যে সেই দেবী প্রতিমাকে বলতে গেলে হাতে করে মানুষ করেছি। তার পরে তার সব শেষও করলাম। তাই প্রাণ পোড়ে। তা কর্তার কি আর এখন উচিত হচ্ছে অতোবড়ো মেয়ে ঘরে বসিয়ে রেখে নিজে ঘরে বৌ আনা!'

গৌতমেব রিহার্সাল ঝাপসা হয়ে যায়।

গৌতমের নির্ভুল কষা অঙ্ক উল্টোপাল্টা হয়ে যায়।

মেয়ে ঘরে বসিয়ে রেখে নিজে ঘরে বৌ আনা!

কে করতে বসেছে এমন কাজ? টুন্নুর বাবা?

টুন্নুর সমস্যা তাহলে আপাতত এই। তাই টুন্নু এ বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে চায়।

টুন্নুর জন্যে আরো একঘর মমতা জমা হলো। আহা বেচারী টুন্নু, মনের মধ্যে দুঃখের পাহাড় নিয়ে হাসে, গল্প করে।

তারপর ভাবে, যেমন আমি।

আর সঙ্গে সঙ্গেই ভাবে, এই আবার একটা বাড়তি কষ্ট টুন্নুর।

টুন্নুব টেবিলে রাখা টুন্নুর মায়ের সেই দেবীপ্রতিমার মতো মুখটি মনে পড়লো গৌতমের।

গৌতম আস্তে বললো, 'ওকে একবার ডেকে দেবেন?'

বামুনদি নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'দেখি কাল থেকে তো ডেকে ওঠাতে পারিনি। বাপ দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করে, সৎমা ঘরে আসে, এ ঘটনা অবিশ্যি জগতে নতুন নয়। কিন্তু এ যে বড় লজ্জার।··· কোথাকার কোন এক ফ্যাশানি বিধবা মাগীকে নাকি বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপেছে! ঘরে-পরে মুখ থাকবে?···এই লজ্জাতেই বোধহয় বাছা—'

বামুনদি চলে যায়।

গৌতমকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে রেখে যায়।

গৌতম এখন কি করবে? ক্ষমা চাইবে, না সান্ত্বনা দিতে বসবে? নিজেকে ধিক্কার দেবে, না টুন্নুর বাপকে?

মনের বীণায় একটি মাত্র তার বেঁধে এনেছিল গৌতম, একটি মাত্র সুর। সে সুর শুধু ভালবাসার সুর, অনুতাপের সুর।

এখন যেন 'জড়িয়ে গেল সরু মোটা দুটো তারে।'

অতএব গৌতমের এখন আর শুধুই অনুতপ্ত প্রেমিকের ভূমিকায় মগ্ন থাকলে চলবে না, এখন হিত-পরামর্শদাতা বিচক্ষণ অভিভাবকের ভূমিকাও নিতে হবে। টুন্নুকে তার কষ্টের ঘর থেকে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব উদ্ধার করে নিয়ে যেতে হবে বিজয়ী রাজপুত্রের মতো।

পিসি রাজী না হলে, কেবলমাত্র নিজের চেষ্টাতেই।

হয়তো বাধ্য হয়ে এখন আমাকে টুন্নুর টাকার ওপরই ভরসা করতে হবে, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে উঠবো আমি।

টুন্নু এসে ঘরে ঢুকলো।

এইমাত্র চোখ মুখে জল দিয়েছে বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু কী রোগা, কী ছোট্ট, কী বেচারী, কী অসহায় অসহায় দেখাচ্ছে টুন্নুকে।

সত্যি বুঝি কেঁদে কেঁদে আধখানা হয়ে গেছে টুন্নু।

এই টুন্নুকে কি গৌতমের থেকে বয়সে বড় একটা মেয়ে দেখাচ্ছে?

স্রেফ একটা রোগা চড়াই পাখি।

যেন গৌতম নামের একটা দীর্ঘ বৃক্ষে আশ্রয় নিতে এসেছে।

অনেক কথা রিহার্সাল দিয়ে এসেছিল গৌতম, কিছুই বলতে পারলো না। শুধু ওর একটা হাত দু'হাতে চেপে ধরে বললো, 'টুন্নু!'

কতোক্ষণ পরে যেন বললো, 'টুন্নু, আজ আমি তোমায় আদর করবো। অনেক আদর করবো।'

টুন্নুর শুকনো মুখে হঠাৎ একটুকরো দুষ্টু হাসি ফুটে উঠলো।

টুন্নু সেই হাসিমাখা মুখটা নীচু করে বলে, 'বলে-কয়ে? হয় না।'

'টুন্নু, আমরা আর দিন গুনে গুনে দিনের অপেক্ষায় বসে থাকবো না।'

'তবে কী করবে শুনি?'

'আমরা বিয়ের মতো বিয়ে করবো টুন্নু! আমাদের বিয়েতে শাঁখ বাজবে, হোমের আগুন জ্বলবে, আলপনা আঁকা হবে। এইমাত্র মনে মনে সব ঠিক করে ফেললাম টুন্নু। আমার এক বন্ধুর মাকে ভার দেবো তোমাকে বরণ করবার। আমার খুব বন্ধু।'

বিয়ের কথা থেকে ক্রমশঃ নতুন পাতা সংসারের ছবি আঁকায় চলে যায় ওরা।

টুনু বলে, 'ঘরের মাঝখানে খাট পাতা আমার দু' চক্ষের বিষ, খাট থাকবে জানলার ধারে।'

গৌতম বলে, 'আর কি, বৃষ্টি এলে ভিজে যাক!'

'ইস, ভিজে অমনি গেলেই হলো। আমি মরে যাবো নাকি?' তারপর টুনু বলে, 'আমি কিন্তু বারান্দায় একটা নীল খাঁচা ঝুলিয়ে ছোট্ট ছোট্ট মুনিয়া পাখি পুষবো।'

গৌতম গলা তুলে বলে, 'খাঁচায় পাখি পুষবে তুমি? আহ্লাদ! যক্ষুনি কিনে আনবে, তক্ষুনি খাঁচা খুলে উড়িয়ে দেবো।'

'তাহলে তোমার সব বইখাতা ছিঁড়ে দেবো।'

'দিও। লেখাপড়া ছেড়ে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াবো। আর তোমার টাকাগুলো ওড়াবো।'

'উড়িও পুড়িও যা খুশি কোরো, কিন্তু চাঁদের আলোয় বসে তোমায় গান শোনাবার জন্যে ছাদে আমার একটা শ্বেতপাথরের বেদী চাই।'

'আরে দূর দূর, এখনো চাঁদের আলোয় কবিত্ব? হাজার হাজার বছর ধরে চাঁদ এই পৃথিবীর প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্যে যে একটি আলোর জানলা খুলে রেখেছিল, মানুষ অনেক উদ্যোগ আয়োজন করে নিজে হাতে সেই জানলা বন্ধ করে দিয়ে এসেছে।'

'বন্ধ করলেই কি বন্ধ হয়? দেখো—সব ঠিক থাকবে।'

'তোমার মতো মুখ্যুদের কাছেই থাকবে শুধু।'

'মুখ্যু হওয়াই সুখের।'

'তা বটে।'

গৌতম হাসে, 'তা হলে বলছো, আমরা দুজনে একটি মূর্খের স্বর্গ সৃষ্টি করবো? যেখানে চাঁদ যথাবিধি চাঁদমুখে হাসির আলো ছড়াবে, তারারা হারিয়ে যাওয়া মানুষের আত্মা হয়ে ঝিকঝিকে চোখে তাকিয়ে থাকবে, পাখিরা গান গাইবে, ফুলেরা কথা বলবে।'

'ঠিক ঠিক।' টুনু উচ্ছ্বসিত হয়ে হাততালি দিয়ে ওঠে।

চোখের জল কখন শুকিয়ে গিয়ে হাসির ঝর্ণা ঝরতে শুরু হয়েছে। মনের পাথর গলে গিয়ে হালকা স্রোত বইছে।

বাবার বিয়েটাকেও টুন্নু যেন এখন আর মোটেই গুরুত্ব দিচ্ছে না। বলছে, 'যাক গে যাক, আহা 'দুর্বলচিত্ত বেচারী' বলে ক্ষমাই করে ফেলছি। শুধু আমার মা'র সব ছবিগুলো আমাদের বাড়িতে নিয়ে চলে যাবো।'

টুন্নু এই বাড়ি থেকে উদ্ধার হবার আশ্বাস পেয়ে ওর সেই ভাবী সৎমাকেও পরিহাস করতে পারছে।

বলছে, 'বিধবা ভদ্রমহিলা শেষ অবধি একটি সেকেণ্ডহ্যাণ্ডই পেলেন। যাক, এটা মন্দ হচ্ছে না। দুজনের একটা করে অতীত রইল, কারো মনে ক্ষোভ জমবে না। তুমি হাসছো? এখন আর কারো ওপর বিদ্বেষ রাখতে ইচ্ছে করছে না গৌতম!'

বামুনদি একবার চা খাবার খাইয়ে-টাইয়ে গেছে, আর একবার বলতে আসে, 'এখানেই দুটো খেয়ে যাও না দাদাবাবু!'

টুন্নু হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বামুনদির গলা ধরে বলে ওঠে, 'না, ভাতটাত খাবে না, ও এখন চলে যাচ্ছে। কিন্তু আর ওকে দাদাবাবু বলবে না বুড়ি, বলতে হবে 'জামাইবাবু।'

'বেঁচে থাকো, রাজা হও', এই গোছের কিছু একটা বলে বুড়ি পালায়।

গৌতম চোখ কুঁচকে বলে, 'এটা কি রকম অসভ্যতা হলো?'

'ভীষণ ইচ্ছে করলো একটু অসভ্যতা করতে।'

বাঁশীর মতো বাজতে বাজতে বাড়ি ফিরলো গৌতম।

নাঃ, ভয়-টয় নয়।

ভিক্ষুকের প্রার্থনাও নয়, দাবির গলায় বলতে হবে, নিজে নিজেই একটা বিয়ে ঠিক করে ফেললাম পিসি। এখন বলো সে বৌকে বাড়িতে তুলবে, না ছেলেটাকে সুদ্ধ বিসর্জন দেবে।

বেলা অনেক হয়ে গেছে, ছায়া এখন দীর্ঘ হয়ে পাশে পাশে চলছে না, পায়ের নীচে গোল হয়ে হয়ে চলেছে। ঘড়ি নেই হাতে, কে জানে কতোটা বেলা। একটা? দুটো? তিনটে? কে জানে!

পিসি হয়তো ভাবছে, ভুলে ভুলে ভাত না খেয়ে কলেজ চলে গেছি। ছেলেবেলার মতো।

উঃ, ছেলেবেলায় সেই না নেয়ে না খেয়ে ভুলভাল স্কুলে চলে গেলে কী রাগই করতো পিসি! আর গৌতম অবাক হয়ে বলতো, 'ওঃ, তাই ভাবছিলাম, আজ টিফিন আনতে ভুলে গেছি বলেই কি যতো রাজ্যের খিদে এসে জুটেছে! যাচ্চলে, খেয়েই যাইনি?'

আচ্ছা ওই কথাটা বলেই পিসিকে ক্ষ্যাপাবো আজ?

বলবো, 'যাচ্চলে, খেয়েই যাইনি? তাই ভাবছি এতো খিদে পাচ্ছিল কেন?'

তারপর আস্তে আস্তে সব কথা ভাঙবো।

কিন্তু কই, পিসি তো ছুটে তেড়ে এলো না।

গৌতম দোতলায় উঠলো, জুতো খুললো, ঘামের জামা খুলে টাঙিয়ে রেখে নিজমনে বলে উঠলো, 'উঃ, কী দারুণ খিদে পেয়ে গেছে।'

তবু পিসির সাড়া নেই।

ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি? অথবা ঘুমের ভান?

পিসির ঘরের ভেজানো দরজাটা খুললো।

ঘরে কেউ নেই। কী ব্যাপার! দাদুর অসুখ-টসুখ নয় তো?

একটু আতঙ্ক, একটু অস্বস্তি।

আস্তে দাদুর ঘরে এসে ঢুকলো।

দাদু বসে আছেন খাটের ওপর। মাটিতে পিসি। দুটো পাথরের পুতুলের মতো।

কী হয়েছে? কোথাও থেকে কোনো শোক সংবাদ এসেছে নাকি?

কিন্তু ত্রিভুবনে কে এমন আত্মীয় আছে গৌতমদের যে. তার মৃত্যু সংবাদে ছ-ছটো মানুষ একযোগে পাথর হয়ে যাবে!

তবু গৌতমও পাথরের মতোই দাঁড়িয়ে রইলো।

ব্যাপারটা অনুধাবন করতে চেষ্টা করলো।

অনেকক্ষণ কেউ তাকালো না। তারপর দাছ হঠাৎ অদ্ভুত একটা ব্যঙ্গের গলায় বলে উঠলেন, 'এই যে তুমি এসেছো? ভাবলাম বুঝি বিয়ে বাড়িতে নেমন্তন্নে গেছ।···যাক, যাওনি তাহলে। বিভা, চিঠিটা দাও ওকে।'

গৌতম এই অসংলগ্ন কথার মানে বুঝতে পারলো না। গৌতম পিসির দিকে তাকালো।

দাছর কি হঠাৎ বুদ্ধিবৈকল্য ঘটলো!

নইলে বিভা তো কই উঠলোও না, কোনো চিঠিও দিলো না।

দাছ একটু অপেক্ষা করলেন।

তারপর হঠাৎ প্রচণ্ড চীৎকারে ধমকে উঠলেন, 'কই, দিলে না? ওর মা'র বিয়ে আর ও জানবে না? আহা বাপ-মরা ছেলে, আবার নতুন বাবা পেলো, কতো আমোদ!'

'দাছ!' আরো জোরে ধমক দিয়ে ওঠে গৌতম এই সহসা বিকৃতমস্তিষ্ক হয়ে যাওয়া বৃদ্ধকে।

কিন্তু গৌতমের ধমক কাজে লাগে না। দাছ ভয় খায় না।

যেন ছুরি নিয়ে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে কেক্ কাটেন—'ইনিয়ে-বিনিয়ে ছঃখের কাঁছনী গেয়ে চিঠি দিয়েছে যে দিদিমা. .মেয়ে আমার গালে মুখে কালি মাখিয়েছে, মেয়ে আমাকে লুকিয়ে এই কাজ করেছে!—কই দে চিঠিটা।'

বিভা সন্তর্পণে নিতান্ত অনিচ্ছায় একটা চিঠি এগিয়ে ধরে।

গৌতম সেদিকে দৃক্পাত করে না, গৌতম শুধু নিজেকে নিয়ে কোথাও ফেলতে যাবার জন্যে সরে আসবার চেষ্টা করে।

ফেলার আগে যেন পড়ে না যায়, এইটুকুই শুধু চেতনায় ছিল তার।

কিন্তু নির্মম বৃদ্ধের নির্মমতার আশা বুঝি তখনো মেটেনি, তাই শেষবারের মতো ছুরিটা আমূল বিঁধিয়ে দেন। যাতে আর নড়বার ক্ষমতা থাকবে না তার।

'আরে চলেই যাচ্ছো যে! নতুন বাবার নামটাও শুনে গেলে না? ওঃ, মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস্ মজুমদারের জন্যে প্রেজেনটেশান কিনতে যাচ্ছ বুঝি? দামী দেখে কিনো, বনেদী বড়লোক মানুষ, তার ওপর আবার বিজনেসম্যান।'

গৌতম জেগে জেগে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই স্বপ্নটা দেখতে পায়, সিঁড়ি দিয়ে উঠে ছাদের দরজা খুলেই একটা শূন্য গহ্বরে পা ফেলেছে। এ ছাদে জ্যোৎস্না নেই, এ ছাদের ওপরে আকাশও নেই। আশেপাশে উপরে নীচে শুধু একটা জমাট-বাঁধা কালো। চাপ চাপ ঘন।

না, চাঁদের জানালা আর কোনোদিন খুলবে না। মানুষ তাকে রূঢ় হাতে বন্ধ করে দিয়েছে।

——

পালঙ্কশায়িনী

সাবেক বাড়ির গড়নই আলাদা।

চকমিলানো যদি নাও হয়, দালান একখানা থাকবেই, দরদালান।

জীবনবল্লভ রায়ের এই বাড়িটাও যা একখানা দরদালান বুকে করে বসে আছে, তাকে দালান না বলে মাঠ বললেই ভাল হয়। জিনিসপত্রে বোঝাই না থাকলে ফুটবল খেলা যেত। কিন্তু অত বড় দালানখানাও জিনিসপত্রে ভর্তি। সাবেককালের বাড়িও যেমন, সাবেককালের আসবাবপত্রও তেমন। সবই বড় বড় ঢাউস ঢাউস, আজকের দিনে যা প্রীতিকর নয়, ভীতিকর। কিন্তু করা যাবে কি? ওসব তো ফেলবারও নয়, গেলবারও নয়, শুধু অস্বস্তি বাড়াবার।

ওই যে চার হাত চওড়া পাঁচ হাত উঁচু সেগুন কাঠের আলনাটা? ওতে বাড়িসুদ্ধু লোকের কাপড়-চোপড় ঝুলিয়ে রাখার জায়গা থাকলেও রাখছে কি কেউ? যে যার নিজের নিজের ঘরেই ছোট-খাটো ব্যবস্থা করে নিয়েছে।

অবিশ্যি নতুন আসবাব কেনার মতো অবস্থা বাড়ির বর্তমান মালিকদের নেই, হয়তো ঘরের কোণে দড়ি টাঙিয়েই কাজ চালাচ্ছে—তবু আগের আমলেব মতো বাড়িসুদ্ধ সকলের কাচা কাপড় কুঁচিয়ে কুঁচিয়ে একটা আলনায় ঝুলিয়ে রেখে, যে যার খুঁজে নিয়ে পরার কথা কেউ ভাবতেই পারে না।

আলনাটা এখন প্রকৃতপক্ষে ঘরশোভা দেবীরই অধিকৃত। ওঁর কাচা থান, মটকার থান ব্যতীতও কাচা কাঁথা, কাচা গায়ের কাপড়, কাচা বিছানার চাদর ইত্যাদিতে বোঝাই আছে ওই দিগ্‌গজ আলনাটা।

শোভা সৌষ্ঠবহীন ওই আসবাবটির পাশে কড়িকাঠে মাথা ঠেকু-

ঠেকু জগদ্দল একখানা দেরাজ আলমারি। নিচের দিকে দেরাজ, ওপরে কাচ বসানো আলমারি। এক সময় বোধহয় মেহগিনি পালিশ ছিল, এখন কালো চিটচিটে। চিটচিটে তো হবেই, তেলচিটেই। 'দেখ্ তোর না দেখ্ মোর'—সকলেই যে ওই দেরাজটার গায়ে হাত মোছে। ভিজে হাত, চুলবাঁধা হাত, ঘি-তেলের হাত।

হ্যাঁ, ঘি-তেলের হাত তো ওরই কাছাকাছি, গেরস্তর ঘিয়ের টিন, তেলের টিন, চিনির বোয়েম, সব কিছুই তো ওই দেরাজের পাশের বিরাট র‍্যাকটায়। র‍্যাকটাও আড়ে দৈর্ঘ্যে বিশাল। মজবুত কাঁঠাল কাঠের।

সাবেকি ভাঁড়ার ঘরের মাল কিন্তু এখন এই দোতলার দালানে আশ্রয় পেয়েছে। আশ্রয় পেয়েছে দুটো কারণে—প্রথমত জীবনবল্লভ রায়ের মৃত্যুর পরে, তাঁর তিন তিনটি কর্তা ছেলে থাকতেও সংসারে সহসা এমন টালমাটাল দেখা গেল, বাধ্য হয়েই একতলাটা ভাড়া দিতে হলো।

অতএব রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, খাবার ঘর, বৈঠকখানা ঘর, চাকরদের ঘর, অতিথি-সজ্জনের ঘর এবং এই দালানের নিচের বিরাট দালানখানির যাবতীয় মাল দোতলায় উঠিয়ে আনতে হলো, সরাতে হলো যেমন-তেমন করে। বৌদের শোবার ঘরগুলিও বোঝাই বোঝাই, তবে ঘরগুলো এতই বড় বড় যে তা সত্ত্বেও চলে যাচ্ছে। বাক্স তোরঙ্গগুলোকে অবশ্য বৃহৎ পালঙ্কের নিচে চালান করা গেছে, কারণ ওই পালঙ্কগুলিও মাঠ সদৃশ, এবং ওর উপর উঠতে হলে চৌকী লাগে।

ভাড়া দেওয়ার প্রাক্কালে কথা হয়েছিল, ছাদে দু'খানা চালা তুলে রান্না ভাঁড়ারের কাজ চালানো হবে। শুধু সদ্য বৈধব্যপ্রাপ্ত ঘরশোভা দেবীর নিরামিষ রান্নাটা দোতলায় দালানের এককোণে—

ঘরশোভা দেবীই তীব্র প্রতিবাদ তুললেন।

'ছাতে রান্না-ভঁাড়ার ? তোদের মায়ের কোমরের বল বেড়েছে, কেমন ? চোদ্দবার সিঁড়ি ভাঙব আমি ?'

ছেলেরা ব্যস্ত সন্ত্রস্ত হয়ে বলল, 'কেন, কেন, তুমি কেন ? তুমি এখানে বসে হুকুম করবে, বৌরা চালাবে। তুমি কি চিরকাল খাটবে ?'

ঘরশোভা হরিনামের মালা কপালে ঠেকিয়ে বললেন, 'ওঃ তার মানে কর্তা যেতে যেতেই আমাকে তোরা বাতিলের দলে ফেলতে চাস ? বৌরা গিন্নী হবে, আর গিন্নীত্ব থেকে নাম খারিজ হয়ে যাওয়া আমি জুলজুল করে সবকিছু তাকিয়ে দেখব বসে বসে ?'

ছেলেরা জিভ কাটল, কপালে হাত ঠেকাল, ব্যস্ত সন্ত্রস্ততর হয়ে বলল, 'এ কী বলছ মা ? ওরা তোমার দাসীর মতো খাটবে—'

'তোরা আর আমায় ছেলে-ভোলাতে আসিসনি বাছা ! তোদের মতলব আমার বোঝা হয়ে গেছে। এ সব বৌদের পরামর্শ, তাও অনুমান করেছি। নচেৎ তোদের ঘটে এত বুদ্ধি হবে না। আমি আগে মরি, তবে বৌরা গিন্নী হবে, এই বলে দিস তাদের। ভঁাড়ার এই দালানে থাকবে, আমার চোখের সামনে, যা লাগবে আমিই বের করে দেবো।'

ছেলেরা বলল, 'তবে তাই হোক। তোমার যা ইচ্ছে।'

'ইচ্ছে মানে ? এ কী আমার শখ-সাধ ? বৌদের হাতে সংসার পড়লে ক'দিন ভেসে থাকতে পারবি ? সপুরী এক গাড়ে ডুবতে হবে না ?'

বৌরা আড়ালে বলল, 'কথা কইবার তো আইন নেই, নইলে বলতে পারতাম—দরাজ হাতটা মা'রই। কমে তো মোটেই পারেন না। আমাদের হাতে হলে এ সংসার এর অর্ধেকে চলত।'

কিন্তু সে তো আড়ালে।

ছেলেমেয়েদের বিয়েটিয়ে হয়ে গেছে, নাতি-নাতনীর ঠাকুমা দিদিমা, তবু সামনাসামনি কিছু বলার সাহস নেই মহিলাদের। কোমরে বাত শ্রীমতী ঘরশোভা দেবীর এমনই দাপট ! এই দাপটের

মূল অবশ্য ছেলেদের মাতৃভক্তি। আবার ছেলেদের মাতৃভক্তির মূল রহস্য খুঁজতে গেলে হয়তো বাড়ির দলিল পর্যন্ত পৌঁছে যেতে হয়, কারণ বাড়ির ট্যাক্সদাতা হচ্ছেন শ্রীমতী ঘরশোভা দেবী। সাবেককালের লোক হয়েও জীবনবল্লভ বাড়িখানি তলে তলে শ্রীমতীর নামে করে রেখেছিলেন। অবশ্য এটা ঠিক স্ত্রৈণতার বশে নয়, গিন্নীকে চুপি চুপি জানিয়েছিলেন, 'আমার নামে থাকলে আমি মরতে মরতেই ব্যাটারা পার্টিশান স্যুট ফেঁদে বসবে, আর যথাসর্বস্ব উকিলের পেটে দিয়ে ইট কাঠ পর্যন্ত বেচে খাবে। এ বাবা স্ত্রীধন, দাঁতটি ফোটাবার ক্ষ্যামতা হবে না।'

'ছেলেরা ভবিষ্যতে আমার ওপরে গোঁসা করবে—' বলেছিলেন ঘরশোভা দেবী, 'বলবে, মা বেটিই কুমন্ত্রণা দিয়ে বাবাকে এই কর্মটি করিয়েছে। অছেদ্দা করবে আমাকে।'

জীবনবল্লভ ঝুনো হাসি হেসে বলেছিলেন, 'ঠিক উল্টো। বরং সবাই মিলে তোয়াজই করবে তোমায়। দান বিক্রীর অধিকার পর্যন্ত রইল যে। কখন কার ওপর চটে গিয়ে তাকে বঞ্চিত করো, অথবা কখন কার প্রতি সদয় হয়ে তাকেই দিয়ে বসো, এই চিন্তার দোলায় দুলে তোমাকে চটাতে তো সাহস করবেই না, সুয়ো হবারই চেষ্টা করবে।'

জীবনবল্লভ তাঁর ছেলে-বৌ সম্পর্কে যতটা ভেবেছিলেন, তারা ঠিক ততটা খারাপ কিনা বলা শক্ত। মাকে ভয় করাটা ঘরশোভার ছেলেদের একটা মজ্জাগত অভ্যাসই বলা চলে। মাকে যে অমান্য করা সম্ভব, কিংবা মা'র কথায় প্রতিবাদ করা সম্ভব, এটা তারা জানে না। অতএব বৌদের 'স্বর' নেই। অতএব এই দালানেই ভাঁড়ার। চালডাল থেকে শুরু করে বড়ি আচার, শুকনো কুল তেঁতুল পর্যন্ত।

কিন্তু নিজে হাতে বার করে দেবার ক্ষমতা কি আর আছে ঘরশোভা দেবীর ?

সে ক্ষমতা তো অনেক দিনই গেছে।

বৌরাই বার করে নেয় পালা করে, ঘরশোভা 'জুলজুল' করে নয়—কটকট তাকিয়ে দেখেন। এতটুকু এদিক ওদিক হলে রক্ষে নেই।

হাতে করে ওসব জিনিস ছোঁননি ঘরশোভা কত কত দিন, তবু সব কিছু তার নখদর্পণে।

এখনো তিনি ছেলেদের কাউকে কাছে বসিয়ে মাসকাবারী ফর্দ লেখান। এখনো কোনোখানে নেমন্তন্ন হলে, লৌকিকতার দরদাম ধার্য করে দেন। বৌদের বাপের বাড়ির দিকে কাজকর্ম হলে, বৌরা যদি অধিক কিছু দিতে চায়, তো সেই চাওয়াটা লুকিয়ে মেটায়। ঘুণাক্ষরে যাতে প্রকাশ হয়ে না পড়ে তার জন্যে আটঘাট কম বাঁধতে হয় না তাদের, মিথ্যা কথাও কম বলতে হয় না।

ভাঁড়ারের ওই র‍্যাকের একেবারে উঁচুটায় থাকে তরকারির ঝুড়ি চুপড়ি। কারণ নিচের দিকে থাকলে ইঁদুরের ভয় আছে। পুরনো বাড়ি, ওসবের উপদ্রব যথেষ্ট। সকাল হলে যে-বৌ আগে চান করে আসে, সে ওইসব ঝুড়ি চুপড়ি নামায়, বঁটি বাসন সব এনে জড় করে, তারপর শাশুড়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে বালিকা বধূর মত প্রশ্ন করে, 'বলুন মা, কী কুটবো!'

পর্বটি অবশ্য কম নয়, নতুন নাতবৌ দুটিও তৎপরে এসে যোগ দেয়। হয়তো শাক বাছে, হয়তো কড়াইশুঁটি ছাড়ায়, হয়তো আলু পটল ছাড়িয়ে দেয়। লোক তো অনেক।

তিন কর্তা তিন গিন্নী, তাদের জনে জনে পাঁচ-সাতটি করে, আবার তাঁদের মধ্যেও দুজন বিবাহিত, সেই নাত-বৌরা, এবং আছে তাদের শিশুপুত্ররা। এছাড়া ঠাকুর আছে, চাকর আছে, ঝি আছে।

সংসারের আয় কমে গেছে, হাল বেহাল হয়ে গেছে, কিন্তু ওরা আছে। থাকবেও। কারণ ওরা কর্তার আমল থেকে আছে। ওদের ছাড়িয়ে ব্যয় সঙ্কোচ করার কথা স্বপ্নেও ভাবা যায় না। বলতে গেলে বাড়িরই লোক ওরা।

তাছাড়া এই বৃহৎ সংসারের হ্যাপাও তো কম নয়। বড়

গিন্নী তো নিরামিষ রান্না নিয়ে থাকেন। সেও এই দালানেরই একপাশে। তবে সেখানে আয়োজন আড়ম্বরের কমতি নেই কিছু। যাবতীয় দেশী রান্নাগুলি এখানেই হয়। হয় দুধ, জলখাবার, ক্ষীর ছানা ইত্যাদি।

ওদিকে 'মা লক্ষ্মী' শুকনো হয়ে এলেও ঘরশোভার সকালে ক্ষীর, সন্ধ্যায় ছানার নড়চড় হয় না। তিনি নিজে বারণ করেন না, অতএব ওটার নড়চড় করার কথা ওঠে না।

এই দালানে বসেই ঘরশোভার ছেলেদের আর নাতিদের খেতে হয়। মেয়েমানুষরা রান্নাঘরে খায় খাক, এদের খাওয়া-দাওয়া চোখের আড়ালে করতে দিতে রাজী নন ঘরশোভা।

ফলে টেবিলে খাওয়ার বাসনা আর ইহজীবনে ব্যক্ত করতে পারলো না কেউ। সেই সাবেককালের কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি, সরপোস-ঢাকা ভারী কাঁসার গ্লাশ, বড় কাঞ্চননগরী থালা, গোটা চারপাঁচ সরফুলে-বাটি আর টক চাটনী দই পাথরবাটিতে। কাঁচের বাসনের কথা ওঠে না।

মেয়ে বৌদের দিকে কাঁচ ঢুকেছে, এনামেল ঢুকেছে, এদিকে তাদের আসবার জো নেই।

নাতবৌরা কে কবে শখ করে পাতলা কাঁচের বাটি কিনেছিল, এবং অধিকতর শখ করে শ্বশুরদের পাতের গোড়ায় রেখেছিল ইলিশমাছের টক দিতে, ঘরশোভা তাঁর পালঙ্ক থেকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে বলেছিলেন, 'পাথরবাটিগুলো কি সব ভেঙে গেছে বড় বৌমা? গিয়ে থাকে তো, এই চাবি নাও, আমার সিন্দুক থেকে বার করে দাও।'

বড় বৌমা জানিয়েছিলেন, 'পাথরবাটি সবই আস্ত আছে। ওটা আপনার নাতবৌয়ের শখ!'

'শখ?'

ঘরশোভা বলে উঠেছিলেন, 'কী ছিরির শখ রে! হ্যাঁ, বুঝতাম শ্বশুরদের জন্যে রুপোর বাটি গড়িয়ে পাতের পাশে বসিয়ে দিতে পেরেছেন ঠাকরুনেরা, তাকে বলি শখ। কাঁচও যা মাটিও তা।

কাঁচের বাটি মাটির খুরির সামিল। শকড়ি হলেই অশুদ্ধ।'

অতএব ঘরশোভার ছেলেরা এবং নাতিরা পাথরবাটির আওতা থেকে মুক্ত হতে পারল না। বাসনের সিন্দুকে এখনো বহু বাসন তোলা আছে ঘরশোভার, কাঁসার পিতলের পাথরের। মাঝে মাঝে এক-আধটা বার করা হয়। এই চাবি-টাবি সবই ঘরশোভাব আয়ত্তে। এখনো তিনি আঁচল থেকে খুলে এগিয়ে দেন, বৌরা কি নাতনীরা কি নাতবৌয়েরা নিদেশমতো বার করে দেয়, আবার চাবি বন্ধ করে ওঁকে চাবি ফেরত দেয়।

বড় নাতবৌ নিজের শাশুড়ীর কাছে বলে, 'এখন আর কাঁসার বাসনে কেউ খায় না বাবা! যা সব ভারী ভারী বাসন আছে আপনাদের, বদল দিয়ে সব স্টেনলেস্ স্টীলের কবা যায়। দই খান, নেবু খান, টক খান, ওই এক জিনিসেই চলবে। ওই ভারী ভারী কাঁসারগুলো রাখার কোনো মানে আছে?'

শাশুড়ী মলিনা মলিন হাসি হেসে বলেছে, 'তোমাদের দিদি-শাশুড়ী বেঁচে থাকতে এ সংসারের একচুল এদিক ওদিক হবে না বাছা, বলা বৃথা।'

'তবে আর কী করা—' কৌতুকপ্রিয় বৌমা উত্তর দিয়েছে, 'দিদি-শাশুড়ীর তো 'অমর বর' পাওয়া হয়ে গেছে। কত হলো? একশো ছাপিয়েছে?'

তা' ওটা হয়তো ঘরশোভার নাতবৌয়ের অত্যুক্তি।

একশো ছাপাতে এখনো ন' বছর বাকি আছে ঘরশোভার, মাত্র একানব্বুই বছর বয়স তাঁর। তবে মেয়েমানুষের প্রাণ তো, সবাই বলে, 'একশো বছর হয়ে গেছে বোধহয়।' বলে, 'গাছ পাথর নেই বুড়ির বয়সের, গাছ পাথর নেই।' বলে, 'এই এক অমর বর পাওয়া মানুষ দেখছি বাবা! জ্ঞানাবধিই ওনার পাকা চুল দেখছি।'

যেন খেলার সব ঘুঁটি পাকিয়ে নিয়ে আত্মস্থ হয়ে বসে একটি মাত্র ঘুঁটি চেলে চেলে খেলার সঙ্গে যোগ রেখেছেন ঘরশোভা।

অথচ আজ কত বছর উনি বিছানায়! কবে যে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে আছেন, ভুলেই গেছে লোকে। তবে পড়ে আছেন বললে ঠিকটি বলা হয় না।

অধিষ্ঠিত আছেন বললেই ঠিক বলা হয়।

অধিষ্ঠিত আছেন ওঁর দাপটের সিংহাসনে, ওঁর বাবার দেওয়া ময়ূবপঙ্খী পালঙ্কে।

পালঙ্কটা সত্যিই ময়ূরপঙ্খী।

তাব একদিকেব বাজুটা ময়ূবের গলা, আর অপরদিকের বাজুটা ময়ূবের পেখম। সেই মেলে দেওয়া পেখমের দিকেই মাথা কবে রাতে শোন ঘরশোভা, আব সারাদিন মোটা মোটা তাকিয়া ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে থাকেন। কোমর থেকে নিচেটা সব পড়ে গেছে।

যবে থেকে পড়েছে, তদবধি ঘব ছেড়ে দালানে আশ্রয় নিয়েছেন ঘবশোভা। কারণ? কারণটা প্রাঞ্জল। পূব দক্ষিণ খোলা যে অতি প্রশস্ত ঘরখানিতে জীবনবল্লভ সগৃহিণী বিরাজ করতেন, সে ঘরটা একটা কোণেব দিকে। কোণের দিকে বলেই দু'দিক যত খোলা-মেলাই হোক, সেখানে পড়ে থাকলে সমগ্র সংসারটাই তো চোখেব আড়ালে থেকে গেল। দৈনন্দিন জীবনলীলার সব স্বাদ থেকে বঞ্চিত হলেন ঘরশোভা। তিনি শুধু হাততোলায় পড়ে থাকবেন, কে কখন মুখ ধুইয়ে দিয়ে যাবে, কে কখন চান করিয়ে দিয়ে যাবে, আর কে কখন ভাত খাওয়াতে আসবে।

কে বলতে পারে, বৌরা ঘরশোভার চোখের আড়ালে বিছানা ছোঁয়া কি মাছের হেঁসেল ছোঁয়া কাপড়ে রেঁধে, ওপর ওপর দেখিয়ে তসর শাড়ি পরে ভাত বেড়ে নিয়ে খাওয়াতে আসবে কি না!

কে বলতে পারে, ঘরশোভার ছেলেদের একখানা করে মাছ দিয়ে তারা নাতিপুতি কুচোকাচাদের বেশি করে খাওয়াবে কিনা, হয়তো যেমন-তেমন করে ভাত বাড়বে ঘরশোভার রাজু, জগু, পানুর। পোশাকী নামে যারা রাজবল্লভ, জগৎবল্লভ, আর

প্রাণবল্লভ।

দুই বড়ো নাতি, যাদের বিয়ে হয়ে গেছে—সত্যবল্লভ আর নিত্যবল্লভ, অর্থাৎ সতু আর নিতু, তাদের সম্পর্কেও ঘরশোভার আলাদা একটি বিশেষ মূল্যবোধ। বিয়ের আগে থেকেই, বড় হয়ে ওঠা ইস্তক। যেন ওদের মায়েরা ওদের দাম বোঝে না, তাই হয়তো অন্য সব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এক দরে ফেলে ছোট বগিথালায় ভাত দেবে, পাতের পাশে নুন লেবু ঘি দই দিতে ভুলে যাবে।

ঘরশোভার কখনো ঘরে পড়ে থাকলে চলে? কোমরই গেছে, চোখ কান তো যায়নি। মাথাভরা বুদ্ধির মাথাও খাননি। এই তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে বসেই রাজ্য পরিচালনার ক্ষমতা রাখেন।

তাই কোমর পড়ে যাবার পর, যখন টের পাওয়া গেল ওটা আর ফিরবে না, ঘরশোভা ছেলেদের হুকুম করলেন, 'আমাকে একবার নামিয়ে ছুতোর ডেকে পাঠিয়ে পালঙ্ক খুলিয়ে দালানে পাতাও।'

ছেলেরা তো শুনে হাঁ।

বলল, 'দালানে পাতাবে? কেন?'

'কেন আবার? তোরা যে একেবারে এইমাত্তর পৃথিবীতে পড়লি মনে হচ্ছে। এখন থেকে দালানেই থাকব আমি।'

'দালানে থাকবে তুমি? রাত্তিরেও?'

'হ্যাঁ রে বাবা! আমার আবার দিনরাত্তির! ভগবান যখন বিছানাই সার করে দিল, তখন বিছানাটাকেই সংসারের মাঝখানে এনে বসাই। নইলে ওই কোণের ঘরে পড়ে থাকা তো? জেলখানার আসামীর মতোই। যে যা খুশি করবে—টেরও পাব না। তোরা দৈনিক দু'বার 'মা, এবেলা কেমন আছ?' বলে কর্তব্য সারতে ঘরে ঢুকবি, আর বৌমারা আমায় পালা করে ভাত খাইয়ে আর পালা করে সেবা করে কর্তব্য করবে। ব্যস্, বাকি মানুষগুলোকে চোখে দেখতেই পাব না।'

'একথা কেন ভাবছ মা,' বলেছিল বড় ছেলে রাজু, 'তোমাকে

ভিন্ন সংসার চলে ? সবই তোমার সামনে হবে তোমায় জিগ্যেস করে করে—'

'হ্যাঁ। জিগ্যেসা করবে !'

ঘবশোভা একটু তিক্ত হাসি হেসে বলেছিলেন, 'কিন্তু জিগ্যেস মতো কাজ কববে এ গ্যাবান্টি দেবে কে আমায় ? এই জগৎটাই তো ফাঁকিবাজ বাবা !'

অতএব জগতেব ফাঁকিব ওপব তদাবকী কবতে ঘবশোভা ঘব ছেড়ে দালানে এলেন।

দাপুটে শাশুড়ী আছেন, তাই তিন জায়ে ভাব আছে—মলিনা, সবস্বতী আর পঙ্কজিনী—তিন জা। কাবণ তাবা একই দুঃখে দুঃখী, একই শাসনের ছত্রতলে শাসিত !

ময়ূরপঙ্খী পালঙ্ককে বাইবে আনতে যখন মুটে এল, আব স্ক্রু খোলবার জন্য ছুতোব এল, তিন জায়ে বলাবলি করল, 'ভেবেছিলাম রুগী হয়ে পড়লেন, বিছানাই সাব হলো, এব্যব আমাদেব একটু বেহাই হলো, তা এ বেশ ভাল বুদ্ধিই করেছেন !'

কিন্তু সামনে অন্য কথাই বলল, 'ভালই হলো বাবা ! এ তবু মা'র চোখেব সামনে সব হবে, আমরা যেমন নিশ্চিন্দি ছিলাম তেমনি নিশ্চিন্দিই রইলাম।'

ঘবশোভা মৃদু হাসলেন।

ঘরশোভা অতঃপর দালানশোভা হয়ে বসলেন।

তা, সত্যি কথা বলতে, শোভাই বটে, এখনো এই বয়সেও বুড়ি যেন পাকা আমটি। রঙের কী জেল্লা, গায়ের মাংস কী তুলতুলে। আর মুখের কাটুনি কী, যেন ছুরি দিয়ে কেটে বানিয়েছে। রূপেব জন্যেই নাম। দশ বছর বয়সে এ সংসারে এসেছিলেন, আর এখন এই একানব্বই বছব বয়েসে স্থির অবিচল হয়ে বিবাজ করছেন। কখনো বাপের বাড়ি গিয়ে থাকতে দেখেনি কেউ, কখনো হৈ হৈ করে তীর্থ করতে যেতেও দেখেনি। গিয়েছেন কাশী, পুরী, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, কিন্তু সে যাওয়া সমগ্র সংসার নিয়ে।

জীবনবল্লভের তখন অনেক বোলবোলাও, সপরিবারে তো গিয়েই-ছেন, সঙ্গে বামুনঠাকুর ভক্তিনাথ গেছে, ঝি সুহাসিনী গেছে। শুধু চাকর অনন্তটাই বঞ্চিত হয়েছে, সে গেলে বাড়ি দেখবে কে?

তা এসব অল্পবয়সের ব্যাপার।

ছেলেদের তখনো বিয়ে হয়নি।

রাজু, জগু, পানু ইস্কুলের ছেলে। তিন মেয়ে পুণ্যময়ী, আলোময়ী আর দিব্যময়ীর মধ্যে শুধু পুণ্যর বিয়ে হয়েছে। তবে তাকেও আনিয়ে নিয়েছিলেন শ্বশুরবাড়ি থেকে।

ছেলেদের বিয়েটিয়ে দেবার পর আর সংসারের চৌকাঠ থেকে পা বাড়াননি ঘরশোভা। প্রাণমন ঢেলে সংসারই করেছেন, তার শোভা সৌষ্ঠব (অবশ্য তাঁর নিজের রুচিমত) দেখেছেন, লোক-লৌকিকতা, এসোজন-বসোজন, কুটুম-কাটুম, বারব্রত, পুজো-পাঠ, লক্ষ্মীষষ্ঠি, মনসা মাকাল, শনি সত্যনারায়ণ, এইসব নিয়েই থেকেছেন।

ঘরে বাইরে সবাই বলেছে, 'হ্যাঁ, একখানা মানুষ বটে!' ঘরেও বলেছে বৈকি। দাপটের জন্য ভয় করুক, শাসনে পীড়া বোধ করুক, ব্যক্তিত্বকে সমীহ না করে উপায় কি? পক্ষাঘাতগ্রস্ত অশক্ত মানুষটাকেও ওই সমীহর পূজা না দিয়ে পারে না কেউ। কারণ একটা জিনিস জানে সবাই, ঘরশোভাকে দিয়ে কখনো নীচতা ক্ষুদ্রতা শঠতা ছলনা কি অন্যায় মিথ্যাচার সংঘটিত হবে না। ঘরশোভা ন্যায় আর সত্যের একটি জ্যোতির্বলয়ের মধ্যে দীপ্যমান।

অনেকদিন আগে দাসী সুহাসিনী একবার মেজবৌ সরস্বতীর ঘর থেকে একখানা চিরুনী চুরি করেছিল, অথবা না বলে-কয়ে নিয়েছিল, সোনার চিরুনী নয়, এমনি চুল বাঁধবার মোটা চিরুনী, ঘরশোভা সেটি জানতে পেরে তাকে সকলের সামনে মেপে একশো হাত নাকে খত দিইয়েছিলেন।

বলেছিলেন, 'ও চিরুনী তুই নে, তোর মাথা আঁচড়ানো

চিরুনীতে আমার বৌ মাথা আঁচড়াবে না, তবে যখনই অপরের জিনিসে লোভ আসবে, নাকের ঘসটানিটা মনে আনিস।'

আর একবার চাকর অনন্ত ঘরশোভার ঘরের মেজে থেকে একখানা একশো টাকার নোট কুড়িয়ে পেয়ে, হঠাৎ লোভের বশে সেখানা গাপ করে ফেলেছিল, তাকেও যা নয় তাই করেছিলেন।

এমনিতে ঘর মোছার সময় সিকিটা আধুলিটা আনি দুয়ানিটা যখন তখনই কুড়িয়ে পেয়েছে অনন্ত, এবং সঙ্গে সঙ্গে দিয়েও দিয়েছে, একবার একখানা দশ টাকার নোট পর্যন্ত, এবং হাসি হাসি মুখে বলেছে, 'মায়ের বজ্জর আঁটুনি ফস্কা গেরো। ইদিকে বাজারের বেলায় আধলাটির পর্যন্ত হিসেব নেবে। অথচ ঘরের মেজেয় টাকা-পয়সার হরির লুঠ।'

কিন্তু একশো টাকার লোভটা সামলাতে পারেনি বেচারা। নিয়ে গেঁজেয় রেখে দিয়েছিল।

সকালের কাজকর্ম—ঘর মোছা কাপড় কাচা মিটলে বিকেলে অনন্তকে ডাকলেন ঘরশোভা। এবং বিনা ভূমিকায় বললেন, 'একশো টাকার লোভটা আর সামলাতে পারলি না, কেমন?'

অনন্তর মুখটা অবশ্যই সাদা হয়ে গেল, থতমত খেয়ে বলল, 'কি বলছেন মা?'

'যা বলছি, খুবই বুঝতে পারছিস। চুলে তো পাক ধরে এল, এই সংসারে কাজ করছিস সেই বয়সকাল থেকে, বলি চুরি করতে ঘেন্না এল না? লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু—একথাটা শুনিসনি বুঝি কখনো?'

বলা বাহুল্য, ঘরশোভা দেবীর তীব্র কণ্ঠে আকৃষ্ট হয়ে বাড়ির সকলেই ততক্ষণে এসে হাজির হয়েছে ঘরশোভার ঘরে। (হ্যাঁ, তখনো তো ঘরেই। ঘরের কর্তাও তখন বেঁচে।) ঘরশোভা সেই সমবেতর সামনে আরো জোর দিয়ে বললেন, 'এখন তোমরাই বলো অনন্তকে রাখা উচিত, না ছাড়ানো উচিত? - ঘরে যদি তোমরা বৌমায়েরা সোনাদানাই খুলে রাখো, পুরনো লোক সেটা

কুড়িয়ে না দিয়ে ট্যাকে পুরবে ? ও যে কেমন বিশ্বাসী তা পরীক্ষা করবার জন্যে আমি ঘর মোছার আগে টাকাটা সিকিটা আধুলিটা পয়সাটা ঘরের মেজেয় ফেলে ফেলে রাখি, তখন অনন্তবাবু আমাদের খুব পরীক্ষায় পাশ। আর যেই একটু বেশি মাল হাতে পড়েছে, ব্যস, পরীক্ষায় ঝেড়ে ফেল !···পুরনো লোকের হাতে যে লোকে লোহার সিন্দুকের চাবি পর্যন্ত তুলে দেয় রে অনন্ত !'

অনন্তর আর অবোধ সাজা চলল না, হাউমাউ করে কেঁদে নানান উল্টোপাল্টা কথা বলতে শুরু করল। একবার বলল, 'পরে দেবো ভেবে ভুলে গিয়েছিলাম', একবার বলল, 'আপনি ঘরের মেজেয় ফেলে রাখেন তাই জব্দ করবার জন্যে লুকিয়ে রেখেছি', আবার বলল, 'আর কখনো এমন কাজ করব না—'

ঘরশোভা বললেন, 'আর কখনো পাচ্ছিস কোথায় ? আবার রাখব নাকি ? সবাই ভাবত মা'র এত হিসেব, আর মা এত অসাবধান ! আমি কথাটি কইনি। দেখি কার কত বুদ্ধির দৌড় ।'

সে যাত্রা হাতেপায়ে ধরে অনন্ত টিকে গেল। আর ঘরশোভার পরিজনদেরও একটা জটিল অঙ্ক মিলে গেল ! সত্যিই ভেবে পেত না তারা, মা এত হুঁশিয়ার অথচ আঁচল খুলে টাকা পয়সা পড়ে যায়—টের পান না ?

এভাবে পরীক্ষার কবলে তিনি তাঁর বৌদেরও ফেলেছেন আগে আগে। এখনই না হয় গিন্নীবান্নী হয়ে গেছে তারা। একদা তো বালিকা ছিল ? খপ করে বলে বসতেন, 'বৌমা, শাড়ি তো পালটাচ্ছ, বলি ভেতরের সেমিজ বডিসগুলো পালটেছ ?'

ভয়ে শাকমূর্তি হয়ে ওরা হয়তো বলত 'পালটেছি', কিন্তু ঘরশোভা দেবী অত অল্পে সন্তুষ্ট হতেন না, বলতেন, 'কই, সেই কাচা ভিজে-গুলো দেখি ?'

কাচা হয়নি ?

কলঘরে পড়ে আছে ? ঘরশোভা জোর গলায় ডাকতেন, 'অ

সুহাসিনী, বৌদিদির সেমিজ বডিস কি সব যেন চানের ঘরে পড়ে আছে, কেচে আন দিকিনি।'

বৌ যদি বলত, 'আমি গিয়ে বলছি—', ঘরশোভা তাকে থামিয়ে দিতেন। 'থাক্ থাক্, তোমায় আর যেতে হবে না, আমার গলা চিড়িয়াব মোড় অবধি যায়। ঠিক শুনতে পাবে।'

সুহাসিনী বলতো, 'কষ্ট? কোথায়—?'

ঘরশোভা বলতেন, 'জানি থাকবে না।'

এইভাবেই বৌদের শায়েস্তা করতেন ঘবশোভা দেবী। বলতেন, এখনো বলেন, 'সব সইতে পারি, মিছে কথা সইতে পারিনে।'

'শুচিবাই' বললে হয়তো একটু অবিচার কবা হবে, ঘবশোভার ঠিক শুচিবাই নয়, ববং বলা যায় শুচিতা বাই। বাড়ির সকলকেই উনি শুচি রাখতে চান—কায়ে মনে বাক্যে।

কর্তা কর্তা ছেলেরা আর গিন্নী গিন্নী বৌরা থেকে শুরু করে নাতির যে ছোট্ট ফুলতুল্য ছেলেটা ঘরশোভাকে 'কর্তামা' বলে ডাকতে শিখেছে, তাকে পর্যন্ত সকালবেলা 'বাসি' জামা কাপড় থেকে মুক্ত হতেই হবে।

দৈবাৎ ওই বাচ্চাটা যদি রাতে ঘুমনো জামা পরে সকালে ঘুরে বেড়ায়, ঘরশোভার শ্যেনদৃষ্টি মুহূর্তে ধবে ফেলে সেটা।

অমনি তারস্বরে হাঁক পাড়েন তিনি, 'নাতবৌ, বলি অ বড় গিন্নী ঠাকরুন, ছেলে রাতের জামা পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে যে বড়?'

বড় নাতবৌ চম্পাকলি, যদি অপরাধ স্বীকার করে বলে, 'এই রে ভুলে গেছি ঠাকুমা, এক্ষুনি সুহাসপিসিকে দিয়ে ছাড়িয়ে কাচা জামা পরিয়ে দিচ্ছি—' তাহলে অল্পের উপর দিয়ে গেল।

শুধু এইটুকু বলেই ক্ষান্ত ঘরশোভা, 'এতো ভুলই বা হয় কেন?'

কিন্তু দৈবাৎ যদি চম্পাকলি ফট করে বলে বসে, 'ছাড়িয়েছি তো ঠাকুমা,' তাহলেই আর রক্ষে নেই।

নাতবৌ বলে রেয়াৎ করবেন না ঘরশোভা, ন ভূতো ন

ভবিষ্যতি করে ছাড়বেন। এবং ভাল ঘরের মেয়ে হয়েও মিথ্যাচারের অভ্যাসটা কি করে হলো চম্পাকলির, তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করবেন। আর বলবেন, 'অজ্ঞানের দশটা বছরও যদি বাদ দাও, এই আশী বছর ধরে মানুষ চরাচ্ছি নাতবৌ, আমার কাছে চালাকি দেখাতে এসো না। আমার চোখে ধুলো দেওয়া তোমার বাপের তো দূরের কথা, ঠাকুর্দারও নেই। ওই জামাটা পরে ও কাল সারা বিকেল এইখানে খেলেছে, আমি নিরীক্ষণ করে দেখেছি। আর তুমি স্বচ্ছন্দে বললে, 'এটা তো সে জামাটা নয় ঠাকুমা, অন্য জামা।' ···ঘাসের বীচি খাই না গো বাছা, ধানের চালের ভাত খাই, মিথ্যে ধরার ক্ষমতা আমার আছে। আর যদি আশা করো বুড়ির চৈতন্য লোপ পেয়েছে, তাহলে এইরকম প্রতি পদে পদে বাক্যি খেতে হবে তা বলে রাখছি, তাতে তোমার ওই গাছতলায় বসা উকিল বরটা যদি আমার নামে 'কেস' করে তো করুক।'

সত্যিই ঘরশোভার বড় নাতি সত্যবল্লভ প্রায় গাছতলায় বসা উকিলই। প্র্যাকটিশের খাতায় নাম লিখিয়েছে কতদিন, কিন্তু এখনো পসারের নামগন্ধ নেই। যায় আসে এই পর্যন্ত।

ঘরশোভা যেন অনুমানেই সব বুঝতে পারেন, তাই বলেন—গাছতলায় বসা বরটা।

চম্পাকলি নামটি কিন্তু ঘরশোভারই দেওয়া। সেদিকে রুচি পছন্দ বেশ আছে। বৌয়ের নাম ছিল শুধু চাঁপা। ঘরশোভা নাক সিটকে বললেন, 'নাম শুধু চাঁপা? নামটা ভাল নয়, যেন ঝি ঝি গন্ধ। বস্তির ঘরেই অমন ঠ্যাংঠেঙে নাম রাখে। আমি নাতবৌয়ের নাম দিলাম 'চম্পাকলি'। পছন্দ হবে? সতে যা তো—জিগ্যেস করে আয়। অপছন্দ হলে—চম্পকলতা, নাম থেকে একেবারে ছেড়ে চলে যাওয়া চলবে না। মা-বাপের দেওয়া নাম।'

তা প্রথমটাই পছন্দ হয়ে গেল, কাজেই দ্বিতীয়টায় আর হাত দিতে হলো না।

সত্যবল্লভ বলল, 'যাক, বুড়ির পছন্দটা খারাপ নয়।'

চম্পাকলি বলল, 'ভাল একখানা নাম নিয়েই বা কি? ডাকার মধ্যে তো 'বৌমা আর নাতবৌ।'

'বাঃ, আমি ডাকব চম্পাকলি বলে।'

'কোথায় ডাকবে? রাত্তিরে যখন বালিশে কান চেপে শোব, তখন তো? তোমাদের এই সনাতনী বাড়িতে কি আর আমাকে নাম ধরে ডেকে কথা বলার সাহস হবে তোমার?'

তা সত্যবল্লভকে এ ধিক্কার মাথা পেতে নিতেই হয়। সত্যিই সে সাহস নেই ওর।

এ বাড়িতে এখনো পঞ্চাশ বছর আগের হাওয়া বিরাজমান। চম্পাকলি যখন রাগে অপমানে চোখের জল চেপে ছেলেকে কাচা জামা পরাতে বসে, সত্য ঘরে থাকলে বলে, 'বুড়িকে ক্ষেপাও কেন?'

'উনি তো সর্বদাই ক্ষেপে আছেন।'

চম্পাকলি বলে, 'এ সংসারে ক্ষ্যাপা সবাই। এক ক্ষ্যাপার তালে তাল দিয়ে একটা বৃহৎ সংসার চলছে, এ ক্ষ্যাপামির হিসেব কষেছ কোনদিন? এইটুকু একটা বাচ্চাকেও যে সকালবেলা কাচা-জামা পরে বিশুদ্ধ হতে হয়, এমন পাগুলে কাণ্ড জন্মেও দেখিনি।'

'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাটা ওঁর মজ্জাগত বুঝলে', সতু বলে, 'আসলে নিজে খুব খাঁটি তো, অন্য ধরনের কথা একেবারে বরদাস্ত করতে পারেন না। খাঁটি আর স্পষ্ট বক্তা!'

আসলে ওই গুণটির জন্যেই ঘরশোভা দেবীর এত ক্ষমতা। সবাই শ্রদ্ধা সমীহ করে। নাতিরা আড়ালে 'বুড়ি' ভিন্ন বলে না, তবুও সমীহ করে।

যদিও নাতবৌ বলে, 'এতটা স্পষ্ট বক্তা হবারও আবার মানে থাকে না। মানুষ মানুষের সঙ্গে ভদ্রতা সৌজন্যটুকুও রাখবেন না?'

'সেকি সৌজন্য রাখবেন না।'

বলে ওর উকিল বর।

মেজো নাতবৌ গৌরী অতি ধূর্ত মেয়ে, তাকে কখনো এসব বিপাকে পড়তে হয় না, সে ঠাকুমার সর্বাপেক্ষা সুয়ো। কাজেই 'স্পষ্টকথা' শোনবার 'সুযোগ' তার বড় আসে না।

তবে সব থেকে স্পষ্ট কথা শুনতে হয় ঘরশোভা দেবীর রাজু, জগু আর পান্নুকে। না হোক, হক্ কথা শুনিয়ে দেন ওদের ঘরশোভা।

অনেক দিন আগে, যখন সরকারী সার্কুলার জারি হলো, হাজার টাকার নোট অচল হয়ে যাবে, তখন ছেলেরা ভেবে দেখল—কথাটা মাকে বলা দরকার।

কারণ পরে মা বলতে পারেন, 'আমায় কেন বলিসনি ?'

কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টাটা বাঁধবে কে ? তিন জনেই বাধুক তবে।

ঘরশোভা সেই দিনই ঘর থেকে নাম কাটিয়ে দালানে আশ্রয় নিয়েছেন। ময়ূরপঙ্খী পালঙ্কে বসে আছেন তখন, গোটা পাঁচছয় ছোট বড় মেজো সেজো নানান মাপের তাকিয়া আশেপাশে ঠেসে।

ঘরশোভার পরনে ফর্সা ধবধবে থান, গলায় মোটা বিছেহার, মুখ ভর্তি পান দোক্তা, হাতে একটা পিকদানী। সর্বদাই এটি লাগে বলে একমুহূর্তও কাছছাড়া করেন না ঘরশোভা এটিকে।

ঘরশোভার শনের নুড়ি চুলটি পরিপাটি করে আঁচড়ে বাধা। তাতে দুটি সোনার কাঁটা গোঁজা।

ছেলেদের দিকে একবার তাকিয়ে একটু নড়েচড়ে বসলেন ঘরশোভা দেবী, কোনো উক্তি করলেন না।

নিজে থেকে কথা বলে সুবিধা করে দেবার পাত্রী ঘরশোভা নন। হোক না কেন ছেলে, বড় আদরের আর বড় স্নেহের—যাদের একটু মাথা ধরলে হরির লুট মেনে বসেন ঘরশোভা দেবী, আর জ্বর ধরলে সত্যনারায়ণ।

মা তাঁর ঝকমকে মাজা পিতলের ডাবরটি মুখের কাছে তুলে পিক ফেললেন, পালঙ্কের পাশে রাখা টুলটায় রেখে দিলেন,

বালিশের তলার চ্যাপটা শিশি থেকে গঙ্গাজল এক ফোঁটা নিয়ে হাত ধুলেন, তারপর পায়ের ঢাকাটা আর একটু টেনে দিলেন।

তিন তিনটে আধবুড়ো ছেলে যে গরুড় পক্ষীর মতো দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে যেন খেয়ালই নেই।

অতএব খেয়াল করিয়ে দিতে হলো।

বাজু গলা ঝেড়ে বলল, 'এখানে এসে শুলে বটে, তোমার অসুবিধে হবে।'

'আমার কিছু অসুবিধে হবে না, হলে হবে বৌমাদের।'

বলে ঘরশোভা আবার ডাবর মুখে তুললেন।

'না তা নয়, মানে চানটানের অসুবিধে তো—'

'চানটান' অর্থাৎ ঘরশোভাকে তো এখন সব কিছুই বিছানায় সারতে হচ্ছে।

কিন্তু তাতে উনি হেলেন দোলেন না।

বড়ো বৌ এবং সুহাসিনী—এই দুজনের সাহায্যে সর্ববিধ শুদ্ধতা বজায় রেখে উনি সব সারেন। দালান তা কি? পালঙ্কের লাগোয়া চাদর টাঙিয়ে অস্থায়ী স্নানের ঘর বানিয়ে নেওয়া যায় না? আর সেই সময়টুকু ছেলেপুলেকে ঘরে আটকে রাখা যায় না?

কাজেই ঘরশোভা বললেন, 'অসুবিধে আমার কিছুই নয়। অসুবিধে বৌদের।'

'তাদের জন্যে ভাবছি না', জগু বললো, 'রাত্রে এই দালানে—'

'তা ঘরের থেকে দালানে তফাতটা কী? চোর যদি দোর-জানলা ভেঙে ঢোকে তো, ঘরেও তা পাবে।'

'সে সত্যি। সুহাসিনী শোবে তো?'

'শোবে! ও তো শোয় এখানেই বরাবর। আর কোন চুলোয় যাবে? তবে মাগী যা নাক ডাকায়, হয়তো দূর করে সিঁড়িতে চালান করে দিতে হবে।'

এবার সাহসে ভর করে পানু।

বলে ফেলে এক ঝোঁকে, 'মা, ইয়ে বলছিলাম কি, শুনেছ

বোধহয়—হঠাৎ অর্ডার হয়ে গেছে হাজার টাকার নোট আর চলবে না।'

ঘরশোভা ফর্সা ধবধবে কপালটায় রেখা টেনে বললেন, 'কী চলবে না?'

'হাজার টাকার নোট গো! আর পনেরো দিনের মধ্যে জমা না দিলে ও নোট ছেঁড়া কাগজের সামিল হয়ে যাবে। শোননি?'

'কোথা থেকে শুনব?'

ঘরশোভা তাকিয়ায় কনুই দিয়ে টিসিয়ে যাওয়া শরীরটাকে একটু খাড়া করে বলেন, 'আমি খবর কাগজ পড়ি? না পার্কে বেড়াতে যাই যে শুনব? তোমরা যা শোনাবে তাই শুনব, যা বোঝাবে তাই বুঝব। তা' তাই যদি হয়ে থাকে, তোমাদের বক্তব্যটা কী?'

এবার রাজু, 'না, মানে, তোমার তো আগে আগে নোট বাঁধিয়ে বড় নোট-করা একটা শখ ছিল? তেমন যদি থাকে দু'একখানা, তো দিয়ে দিলে ভাঙিয়ে এনে দিতাম।'

'এই বক্তব্য?' ঘরশোভা নিজস্ব ধারালো গলায় বলেন, 'এরই জন্যে তিন ভাইয়ে মিলে সেজেগুজে এসে এত ভনিতে! মা তোমার অসুবিধে হচ্ছে—মা তোমার কষ্ট হচ্ছে—হুঁঃ! ওই কী হুজুগ উঠেছে, আর তিন ভাইয়ে সলা পরামর্শ করছিস ওই ছুতো করে মা বুড়ির কাছ থেকে কী আছে না আছে বার করে নিই, কেমন্? নোট অমনি বাতিল হয়ে যাবে, মগের মুলুক কিনা?'

'ওমা, এখন তো মগের মুলুকই হয়েছে। লোকে ঝপাঝপ জমা দিয়ে দিচ্ছে!'

ঘরশোভা অম্লান বদনে বলেন, 'শুধু তোরা বললেই তো আর হলো না, তোদের প্রতিপক্ষের কেউ বললে তবে মানব—'

ঘরশোভার ছেলেরা মায়ের কথায় অপমান বোধ করবার কথা চিন্তা করে না। তাই ব্যাকুল গলায় বলে, 'আমাদের প্রতিপক্ষ আবার কোথায় পাবে তুমি?'

'কেন? তোমাদের ভাগ্নেরা, তারা তো তোদের হিংসেয় মরে। ওরা আসুক একদিন, জিগ্যেসাবাদ করি—'

'ততদিনে আর দিন থাকবে না মা, আর পনেরো দিন মাত্র সময় আছে যে—'

'তা তোদের হাতে যে বিশ্বাস করে তুলে দেবো, তোরা যদি ভাঙিয়ে এনে আর আমায় না দিস?'

অনায়াসেই এই কথা বলেন ঘরশোভা।

এই সবই যেন কৌতুকের কথা ঘরশোভার।

যেন ছোটখাটো ছেলেদের নিয়ে মজা করছেন। ছেলেরাও কি সেই আলোয় নিচ্ছে? নইলে উঠে যায় না কেন আরক্ত মুখে? চলে যায় না কেন?

জগু আবার বলে, 'শেষকালে কিন্তু আমাদের দোষ দিও না মা? হাজার টাকার নোট থাকলে কিন্তু তোমার পচে যাবে তা বলে দিচ্ছি।'

'যাবে পচে!' ঘরশোভা আবার পিক ফেলে বলেন, 'গাছের পাতা কিনা!'

'গাছের পাতারও অধম হয়ে যাবে মা! তুমি বিশ্বাস করো।'

'বলেছি তো আজ বিশ্বাস করব না, অন্যের মুখে শুনব, তবে বিশ্বাস করব।'

ছুরিকাটা মুখে, ছুরির আগার মতো একটু হাসলেন ঘরশোভা দেবী। যেন ছেলেদের চাতুরী ধরে ফেলে মজা দেখছেন।

ওরা ম্লানমুখে উঠে গেল।

আশা করেছিল, এই সুযোগে অন্ততঃ জেনে ফেলবে মা'র কাছে নগদ কত আছে-টাছে। তখনই ঘরশোভার প্রায় আশীর কাছাকাছি বয়েস, কাজেই খুব সংকোচের সঙ্গে হলেও ভেবেছে, মা আর ক' দিন?

অভাব তো খুবই, এতবড় সংসারের উপযুক্ত আয় কোথায়? তেমন মোটা মাইনের চাকরী কেউ করে না, বাবাই এতাবৎকাল

সংসার চালিয়েছেন, ছেলেরা যা পেরেছে এনে মায়ের হাতে তুলে দিয়েছে, ব্যস্। বাবা যে কোন্ উপায়ে উপায় করছেন ভেবে দেখেনি। পরে চোখে অন্ধকার দেখছে। কোনো কিছুতে এতটুকু ঘাটতি হলেই তো ঘরশোভা রসাতল করে ছাড়বেন।

আশা করেছিল ওই নোটের বাতিলত্ব প্রাপ্তির হুজুগে মা'র ভিতরের খবর জানা যাবে। হলো না। এদিকে—

বৌদের গায়ের গহনা বন্ধক দেওয়া শুরু হয়েছে তখন। তোলা গহনা-টহনাগুলোর ওপর দিয়েই যাচ্ছিল, ক্রমশ—বারোমেসেয় টান পড়ছে। ছেলেমেয়ের ইস্কুল-কলেজ আছে, বাজার ক্রমেই অগ্নিমূল্য হচ্ছে।

ঘরশোভার তীক্ষ্ণদৃষ্টি গিয়ে পৌঁছয় মেজো বৌমার গলায়।

বলে ওঠেন, 'মেজোবৌমা, তোমার গলা ন্যাড়া যে—'

মেজোবৌমা বোধকরি উত্তর প্রস্তুত করেই রেখেছিল, বলল, 'বড় ঘামাচি হয়েছে মা, তাই খুলে রেখেছি।'

ঘরশোভা বললেন, 'অবাক করলে বাছা, এই শ্রাবণ মাসে তোমার এত ঘামাচি যে, ছেলের মা গলাটা ন্যাড়া করে বসে রয়েছ? যাও পরে এস।'

'পরব মা, আগে আপনাকে চানটা করিয়ে নিই—'

'উঁহু, এখনি যাও।'

মেজোবৌ আরো অমায়িক গলায় বলে, 'চাবিটা আপনার ছেলের কাছে আছে মা!'

'চাবি আমার ছেলের কাছে? তুমি যে আমায় তাজ্জব করলে বাছা! জগু আবার কবে চাবি রাখে?'

'ওই মানে তখন আমার হাত জোড়া ছিল—'

'হুঁ বুঝেছি।'

পরদিন ঘরশোভা জগুকে ডেকে বললেন, 'আমার ঘর থেকে

লোহার সিন্দুক বার করিয়ে আমার মাথার কাছে দে।'

'সে কী মা!' জগু অবাক গলায় বলে, 'দালানের মাঝখানে লোহার সিন্দুক?'

'তা দালানের মাঝখানে তো তোদের মা-ও রইল। আমায় না মেরে তো আর চোর ডাকাতে কিছু করতে পারবে না। ও ঘরে পড়ে থাকলে কখন কোন ফাঁকে ভেন্ন চাবি গড়িয়ে বৌদের গয়নাগুলোর মতো আমার গয়নাগুলোও বেচে খাবি তোরা, তাতে ঠিক কি?'

জগু চমকে উঠল। জগু মাথা হেঁট করল।

তারপর অন্য ছেলেরা বোঝাতে এল, 'যতই হোক তোমার বয়স হয়েছে—', তোমার পক্ষাঘাত হয়েছে একথা বলল না, বলল বয়েস হয়েছে, 'তুমি কী সামলাবে? সামনে বসে সিন্দুক ভাঙলেও কিছু করতে পারবে না তো?'

'সামনে বসে ভাঙলে, তবু তো টের পাব যে ভাঙল, গেল।'

ঘরশোভা তেমনি কড়া হাসি হেসে বলেন, 'আড়ালে বসে ভাঙলে তো সেটুকুও হবে না।'

অতএব মুটে ডেকে সেকেলে সেই বিশ-পঁচিশ মণ ওজনের লোহার সিন্দুককে বার করে ঘরশোভার মাথার কাছে রাখা হলো। ঘরশোভা ছেলেদের ডেকে একটা চাবি দিয়ে বললেন, 'খোল!'

ছোট ছেলে পান্নু খুলল।

ঘরশোভা মুচকি হেসে বললেন, 'খুব তরস্থ যে? ওতে একটা চ্যাপ্টা কাঠের বাক্স আছে, দে আমার হাতে।'

নির্দেশ মতো কাজ করল পান্নু।

ঘরশোভা অনায়াসে বললেন, 'সমুখ থেকে একটু সর দিকি, সব দেখে ফেলতে হবে না।'

যেন পাঁচ-সাত বছরের ছেলেকে বলছেন। ছেলে চলে গেল।

একটু পরে আবার হাঁক পাড়লেন, 'এই নাও এই একখানা হাজার টাকার নোট, ছাখো গিয়ে পচে গেছে না আছে। দাদাকে,

মেজদাকে একটু পাঠিয়ে দিও।'

আরো দু'খানা নোট দুই ছেলের হাতে দিলেন ঘরশোভা একই মন্তব্যে।

তখন সময় যায় যায়।

ছেলেরা অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে টাকা উদ্ধার করে এনে মা'র হাতে দিল।

ঘরশোভা বললেন, 'ও আর আমাকে ফেরত দিতে হবে না, বৌদের গায়ের গয়না কোথায় বাঁধা-টাঁধা দিয়েছিস ছাড়িয়ে আনগে যা। এত অকালকুষ্মাণ্ডও গর্ভে ধরেছিলাম গো! একখানা সোনাদানা বৌকে দেবার মুরোদ নেই, বেচে খাবার ইল্লুতেপনা!'

এক হাজার করে টাকা নিয়ে অনেক কিছু করা যেত, তবু বৌদের গয়নাই ছাড়াতে হলো। নইলে মা আস্ত রাখবেন না।

এইভাবেই ঘরশোভা চালিয়ে চলেছেন!

পা পড়ে গেছে, নব্বুই বছর বয়েস, তবু জীবনীশক্তির কিছু কমতি নেই। এখনো সমগ্র সংসার হাতের মুঠোয়। এখনো সকালে অনন্তকে এসে দাঁড়াতে হয়, 'মা, কী বাজার আসবে?'

আজও এল।

ঘরশোভা বলতে শুরু করলেন আঙুল গুনে গুনে।

তার সঙ্গে মন্তব্য, 'বলি ওরে অ মুখপোড়া, আলু বুঝি আর নামবে না?'

একমাথা শাদাচুল অনন্ত, এ গালি গায়ে মাখলো না, বললো— 'এ সময় নামবে কি গো মা,' অনন্ত তারস্বরে প্রতিবাদ করে, 'এখন তো আরো বাড়বে চড়চড় করে।'

'হুঁ, তোরও পকেটে পয়সা বাড়বে চড়চড় করে। যা বোঝাবি তাই বুঝতে হবে আমায়। এখনো মরিনি রে, চ্যাড়স এক টাকা করে সের এই কথা বিশ্বাস করব আমি?'

যদিও ঘরশোভা এখন কিলোগ্রামের যুগেই বাস করছেন, তবু প্রাণ গেলেও 'সের পোয়া ছটাক' এসব ছাড়া কিছু বলবেন না।

অনন্ত যত প্রতিবাদ করে, ঘরশোভা ততই যেন মজা দেখেন, 'এক মাছেই তো দিন দশ-বারো আনা পয়সা মারিস অনন্ত! আবার থোড় মোচা কচু কুমড়োয় চাপান দিসনি।'

'চিরটাকাল আপনি বাজার নিয়ে আমাকে অবিশ্বাস করলেন', অনন্ত থলি ঝুলি গোছাতে গোছাতে ব'লে, 'তা দাদাবাবুকে বললেই পারেন সঙ্গে যেতে—'

'দাদাবাবু' অবশ্য প্রৌঢ় তিন কর্তা।

কিন্তু অনন্তও তো এই বাড়িতে থেকেই প্রৌঢ়ত্ব অর্জন করেছে।

ঘরশোভা পিক ফেলে বলেন, 'দাদাবাবুরা নইলে আর কে তোমায় পাহারা দেবে! বলে ওদের নিজের নিজের কাছা সামলালেই বর্তে যাই আমি। তুমি একটু কম খেও, এই হচ্ছে কথা।'

অনন্ত নেমে যায়, সিঁড়িতে নেমে যেতেই পঙ্কজিনী ধরে, 'কী ফর্দ দিলেন, দেখি।'

'ফর্দ আমার মাথার মধ্যে ঠুসলেন, আলু বেগুন কুমড়ো ঢ্যাঁড়স থোড় কচু আমড়া, পাটশাক—।'

পঙ্কজিনী মুখ বাঁকায়, 'সেই রাজ্যের আলাই বালাই? রোজই এসব খেতে ইচ্ছে করে? মাছ কি বললেন?'

'এই তো দাদাবাবু আর খোকাবাবুদের জন্যে কাটা পোনা, বাকি গেরস্তর জন্যে মৌরলা আর ট্যাংরা, আর কুচো খোকার জন্যে সিঙি।'

'চিংড়ি ইলিশ এসব কিছু বলেননি?'

'নাঃ।'

'যতসব আগড়ুম বাগড়ুম—' বলে পঙ্কজিনী মুখ বাঁকিয়ে সরে আসে। আজকের কুটনোর পালা তার, তাই এত বেজার সে।

ঘরশোভা দেবী দালানে পড়ে থাকলেও এসব জানতে পারেন, তাই ভুরু কুঁচকে ছোটবৌমাকেই ডাকান, 'ভয় খেও না, পা টেপাতে ডাকিনি। তবে বলে রাখি, চাকর দাসীর সঙ্গে গুজগুজ ফুসফুস করতে নেই, ওতে মান থাকে না। ছেলেরা আমায় এত এত এনে

দিলেই আমি এত এত খাওয়াতাম তোমাদের, শ্বশুরের আমলে কি চুনো-পুঁটি খেয়েছ কোনোদিন? তবু তো কর্তার আমলের এই বাড়িটি, আর বাড়িভাড়াটি আছে, তাই রামরাজত্ব চলছে।'

পঙ্কজিনী অস্ফুটে বলে, 'গৌরী বাজে মাছ খেতে পারে না, তাই জিগ্যেস করছিলাম কি মাছ আসবে?'

'গৌরী? ভাশুরপো-বৌ?'

ঘরশোভা যেন আমোদে কুলকুলিয়ে ওঠেন, 'তার জন্যে এত দরদ? গৌরী তোমার বাপের কুলের দিকের মেয়ে নয় তো ছোট বৌমা? ···গৌরী পারে না, হুঃ। গৌরীর খুড়শাশুড়ীও পারে না তা জানি। তবে নয় ওই ট্যাংরা মৌরলা ব্যাটা-ছেলেদের পাতে ধরে দিয়ে তোমরা শাশুড়ি-বৌতে কাটা পোনা খেও।'

কথা বলে ঘরশোভা বাজারের পয়সা গুনে গুনে মিলিয়ে বালিশের তলায় রাখেন। এই বালিশের তলাতেই তাঁর সব। ছেলেরা মাসকাবারে যে টাকা ধরে দেয়, নাতিরা মাসকাবারি না বলে যা পারে 'তোমার হাতখরচ ঠাকুরমা' বলে দেয়, আর—বাড়ি ভাড়ার মোটা টাকাটি, সবই ওই বালিশের তলায়। লোহার সিন্দুকের চাবি পর্যন্ত। নিজে অশক্ত বলে চিন্তার বালাই মাত্র নেই।

নাতবৌরা যখন বিশুদ্ধ বস্ত্রে দিদিশাশুড়ীর পায়ে হাত বুলোতে আসে, তখন হাসিঠাট্টাও চলে।

বলে, 'আচ্ছা ঠাকুমা, আপনার তো কোমরের জোর অষ্টরম্ভা, এত সাহস আসে কোথা থেকে?'

ঘরশোভা হেসে হেসে বলেন, 'জোর কি কোমরে থাকে নাতবৌ? থাকে মনে আর মগজে।'

'তা বললে হবে কেন? এই যে এখনি যদি আমি—' চম্পাকলি হেসে বলে, 'আপনার বালিশের তলায় যা আছে ফট করে টেনে নিয়ে দে ছুট দিই, কী করবেন, ধরতে তো আর পারবেন না?'

ঘরশোভা আত্মস্থ গলায় বলেন, 'নে দিকিনি টেনে, দে দিকিনি ছুট্!'

'আহা সে না হয় আমরা ভাল মেয়ে তাই নিলাম না, নিলে তো আপনি কিছু করতে পাবেন না।'

'পাবি কি না দেখিস।'

বলে হাসতে থাকেন ঘরশোভা মুখ টিপেটিপে।

ঘরশোভা দেবীর তিন মেয়ের মধ্যে আলোময়ী আর দিব্যময়ী থাকে দূরে, একজন জলপাইগুড়িতে, আর একজন কাটিহারে, পুণ্যময়ীই কাছে থাকে, সে আসে মাঝে-মাঝে।

এল সে দিন।

ভাজেরা ব্যস্ত হলো, ভাইপোবৌরা তটস্থ হলো, পুণ্যময়ী বললো, 'একখানা তসর মটকা কিছু দে দিকি কেউ, মা'র বিছানায় বসি একটু।'

ঘরশোভা অনায়াসেই বললেন, 'থাক, থাক, আর মা'র বিছানায় বসতে হবে না, ওইখানেই আলগোছে বসো। তোমার বাড়িতে যা মেলেচ্ছয়ানা, চান না করলে শুদ্ধ হওয়া দায়, হেঁসেলে মুরগী ওঠে, ছি ছি।'

মেয়ে এতটুকু হয়ে বলে, 'কি করব বলো মা, নানা মুনির নানামত, যৌথ সংসারে আমার কলম চলে না।'

'চালাতে জানলেই চলে পুণ্যি,' ঘরশোভা দেবী তাঁর নিজস্ব মাজা-ঘষা খনখনে গলায় বলেন, 'কলমের জোর থাকা চাই। এই এ্যাতোখানি বয়েস পর্যন্ত তুই শুধু ভূতের ব্যাগার খেটে মরলি, কলম চালাতে শিখলি না, ধিক্ তোকে। তার মানে কলমটা পাকাটির। যাক্ ওকথা যাক, কতদিন পরে এলি, এখন আর বসে বসে মায়ের পদসেবা করতে হবে না, ওইখানে টুলে বসে দুটো গপ্পো কর। আমার জামাই আছেন কেমন? তোর মেয়ে-জামাই ছেলে-বৌ নাতি-নাতনীর খবর কি?'

তা' সে খবর দেয় পুণ্য, অনেকক্ষণ ধরেই দেয়। ঘরশোভার

জামাইয়ের শরীরে এখন যে এক ডজন রোগ এসে আশ্রয় নিয়েছে, তার ফিরিস্তি দেয়, তার মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে কত জ্বালা, কী ভাবে খাটতে খাটতে প্রাণ যায় তার, সে খবর দেয়, এবং ছেলের বৌ কী পরিমাণ গতর-কুড়ে আর বাপের বাড়ি ঘেঁষা, সে কথা বলে, সর্বশেষে নিজের বাত, অম্লশূল, রক্ত আমাশার খবরও দেয় বিশদ ভাবে।

ঘরশোভা বলেন, 'তোদের দুজনের তাহলে কিছুদিন হাওয়া বদল করা উচিত।'

'হাওয়া বদল?'

পুণ্যময়ী ক্ষুব্ধ হাসি হাসে।

'আমার হাওয়া বদল হবে সেই একেবারে সেখানে গিয়ে।'

ঘরশোভা হাসেন, 'তবে আর কি, তাই ভাল, তাতে পয়সা খরচও নেই।...বৌমারা সবাই মিলে এখানে বসে গুলতানি করছ কেন? বড় ননদ এসেছে, তার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করো?'

বৌরা ঝটপট উঠে যায়।

পুণ্যময়ী কেমন যেন ঈর্ষার গলায় বলে, 'এত বড় বড় বৌদের তুমি এই ভাবে বললে মা? ভয় করল না তোমার?'

'ভয়?'

ঘরশোভা বোতল ঝাকানোর মতো করে শরীরটাকে ঝাঁকিয়ে একটু খাড়া করে নিয়ে বলেন, 'তুই যে অবাক করলি পুণ্যি. রেজো জগা পেনোর বৌদের আমি ভয় করতে যাব? গলায় দিতে দড়ি জুটবে না আমার?'

পুণ্যময়ী হতাশ গলায় বলে, 'কি জানি মা, আমার তো ছোট্ট ছোট জায়েদেরও ভয়, ওই পুঁচকে বৌকেও ভয়!'

'ভয়টা কিসের? মারবে?'

'হাতে না মারুক, বাক্যিতে মারবে। ভয় অপমানের।'

ঘরশোভা অক্লেশে নিজের পেটের মেয়েকেই বলেন, 'গলায় দড়ি তোমারই দেওয়া উচিত মা!'

মেয়ে গভীরতর হতাশার নিশ্বাস ফেলে বলে, 'তুমি তো মা এই

দালান সাব করেছ, চুপি চুপি যে দুটো মনপ্রাণের কথা বলব, তার জো নেই। সব কথা বললে বুঝতে—'

ঘরশোভা দেবী আবার পানের কৌটো খুলে একটি পান গালে দিয়ে বলেন, 'দালান সাব করেছি তো আমি বারো বচ্ছর, হঠাৎ নতুন করে শোক উথলে উঠল কেন? তুই যা বলবি, তা না বলতেই বুঝেছি আমি।'

মেয়ে মাকে জানে, তার কথার ধরনও জানে, তবু মা'র ছেলেদের মতো একেবারে অভিমান শূন্য হতে পারে না।

ধরা গলায় বলে, 'আমার কথা বুঝতে তোমার দায় পড়েছে। মেয়েদের তো তুমি কোনোদিন দামী জিনিস মনে করো না। তোমার কাছে শুধু ছেলেরাই দামী।'

'শুধু আমার কাছে কেন?' ঘরশোভা আত্মস্থভাবে বলেন, 'সমগ্র পৃথিবীর কাছেই। আইনের জোর দেখালে আর গলা তুলে ডাক ছেড়ে বললেই কি আর ভগবানের নিয়ম পাল্টে যাবে? তবে শুধু শুধু 'দালান তুলে' আক্ষেপ করলি, তাই বলছি নতুন করে শোক উথলোন কেন?'

পুণ্য কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, 'আমার আবার উথলোন! কোন জন্মে বিদেয় করে দিয়েছ, কদাচ আসি কুটুমের মতন—'

'মেয়ে সন্তান তো কুটুমই', ঘরশোভা আবার ডাবর মুখে তুলে বলেন, 'কুটুমের ঘরের বৌ তো বটেই।'

'তা জানি, কুটুম হয়েই আছি, তবে তোমার জামাই মাঝে মাঝে বলে, 'একটা কথা মাকে চুপিচুপি জিগ্যেস করো তো', তাই বলছি চুপিচুপি বলব কখন?'

'কী শুধোতে বলে জামাই? বুড়ির কত টাকা আছে?'

মুচকি হেসে চাদর টেনে টেনে পা ঢাকেন ঘরশোভা।

'টাকার কথা জানতে যাবার তার দরকার কি?' পুণ্যময়ী আরো অভিমান ভরে বলে, 'বলছিল বাবা যে তেজারতির কারবার করতেন, তার যা কিছু পাওনা-গণ্ডা সব শোধবোধ হয়েছিল?

ভাইরা তো জানেও না বাবার এ ব্যবসা ছিল !'

'জামাই বা জানল কী করে তা তো জানি না,' ঘরশোভা সেই তাঁর নিজস্ব ধারালো হাসিটুকু হেসে বলেন, 'শুনে তো অবাক হয়ে যাচ্ছি, যে কথা কাকপক্ষীতে জানত না, সেকথা জামাই জানে কোথা থেকে ? সে যাক, জামাইকে বোলো, জামাই মানুষের ও নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। তোদের বাপ একটা বুদ্ধিমন্ত পুরুষ ছিলেন, দরকার হলে কি আর ছেলেদের বলে যেতেন না ?'

জামাইকে মাথা ঘামাতে বারণ করায় পুণ্যময়ীর কান ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে। তবু কষ্টে আত্মসংবরণ করে বলে, 'বাবা আর বলে যেতে সময় পেলেন কখন মা ?'

কথাটা সত্যি, সময় একেবারেই পাননি জীবনবল্লভ, বাইরে থেকে ঘুরে এসেই একগ্লাস জল চাইলেন, সে জল আর খেতে তর সইল না, অজ্ঞান হয়ে পড়লেন, দিন তিনেক সেই অজ্ঞান অবস্থার মধ্যেই কাটিয়ে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

পুণ্যময়ী সেটাই উল্লেখ করল।

ঘরশোভা কিন্তু তার জন্যে খুব কিছু একটা বিষণ্ন হলেন না, বয়সের শান্ পাথরে ঘষাই হতে হতে বোধ করি অনুভূতির সব ধারগুলো ক্ষয়ে যায়।

ঘরশোভা তাই কর্তার কথা উঠলেও মন-মরা হন না। সমান তেজের সঙ্গে বললেন, 'তা তোমার বক্তব্যটা কী তাই বলো ?'

'বক্তব্যটা আর কিছুই নয়, ও বলেছিল, মা যদি যেখানে যত কাগজপত্র মা'র আছে, সব একবার আমাকে দেখতে দেন, তাহলে বুঝতে পারি কোথাও কোনো পাওনা-গণ্ডা পড়ে আছে কিনা।'

ঘরশোভা শেষ পর্যন্ত সবটি শুনে তারপর পানের পিক ফেলে বলেন, 'তা জামাই এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন ? তাঁর তো এতে কানাকড়িও লাভ নেই। টাকা উদ্ধার হলেই কি তিনি সে টাকার ভাগ পাবেন ?'

'ভাগ পেয়ে আমাদের দরকার নেই মা, তোমার ভালর জন্যেই

বলছি। নচেৎ বলবার তো ছিলই অনেক, এখন তো মেয়ে-ছেলে সমানভাবে বাপের বিষয় পায়, বলেছি কোনদিন সেকথা? এ শুধু তোমার ভালর জন্যেই বলা।'

'আমার ভাল?'

ঘরশোভা খনখনিয়ে হেসে ওঠেন, 'সেই যে রামপেসাদী গানে আছে না, 'ঢের ভাল করেছিস কালী, আর ভালতে কাজ নাই। এখন ভালয় ভালয় বিদায় দে মা, আলোয় আলোয় চলে যাই।' তোর কথা শুনে সেই গানটা আমার মনে পড়ে গেল পুণ্য! জামাইকে বলিস আমি এখন ভালমন্দর বাইরে।'

কিন্তু ঘরশোভা দেবী ভালমন্দর বাইরে চলে গেছেন বলে যে, সবাই তাই যাবে তা তো হয় না। পুণ্য আজ এসেছে তার স্বামী-পুত্রের প্রেরণায়। ঘরশোভা দেবীর হাতে যে অনেক টাকা আছে, এবং বাক্সভর্তি গহনাও আছে, তা সকলেরই জানা। নাতি-নাতনীর বিয়েটিয়ের সময় একটু একটু দিয়েছেন বটে, কিন্তু প্রাণ খুলে নয়। দিয়েছেন আংটিটা, মাকড়িটা, তাবিজের ঝুমকোটা, আর গলার চিক, মাথার চিরুনী, এই পর্যন্ত। ভারী গহনা সব তোলা আছে।

ঘরশোভা দেবীর ছেলেদের 'প্রতিপক্ষ' ওদের ঐ ভাগ্নেরা মাকে বলেছে, 'ঢের দিন তো সময় দিল বুড়ি, কিছুই করে উঠতে পারলে না মা, এখনো দেখো চেষ্টা করে। নইলে হঠাৎ কোনদিন বুড়ি ফুট করে পটল তুলবে আর তোমার ভাইয়েরা চাবি হাতিয়ে সব সরিয়ে ফেলে তবে তোমাদের খবর দেবে। তখন দেখবে সব ফক্কিকার!'

তাই আজ পুণ্যময়ী 'চেষ্টা' করতেই এসেছে।

তাই জামাইকে ঘরশোভার ঘোষণা বলে দেবার নির্দেশের পরও পুণ্যময়ী বলে, 'বুঝলাম তো সে কথা, কিন্তু তোমার সন্তানের ভালমন্দটুকু তো দেখবে তুমি? এই যে আমার ফুলটুশির বিয়ে আসছে, তোমার জামাইয়ের অবস্থাও জানো, তোমার কাছে তো কিছু ও আশা করে?'

ঘরশোভা কিন্তু মেয়ের এই কাতরোক্তিতেও বিচলিত হন না, অবিচলিত গলাতেই বলেন, 'আমার অদেষ্টটাই এমনি তেঁতুলগোলা রে পুণ্য যে, আমার দিকের যে যেখানে আছে সবাইয়ের অবস্থা দুরবস্থা। জামাইকে বলিস, মেয়ের বিয়ে আপন অবস্থা মতই দিতে হয়, শাশুড়ীর ক্যাশবাক্সর দিকে তাক করে থাকায় পুরুষত্ব নেই।'

এরপরও পুণ্যময়ীর মুখ থমথমে হয়ে উঠবে না একথা ভাবা উচিত নয়। হয়ে ওঠে থমথমে, পুণ্যময়ী বলে, 'তাক করে কেউ নেই মা, তবে সর্বস্ব ছেলে বৌ পাবে, মেয়েরা কিছু পাবে না। এ তো আর আইন নেই? তোমার অত গহনার মধ্যে একখানা করেও ভারী গহনা তোমার তিন মেয়ে পাবে, এটা কি অন্যায় আশা?'

'মরে গেলে নিস।'

বলে আর একটা পান বার করেন ঘরশোভা।

পুণ্যময়ী একেবারে টুলটা ঠেলে সরে গিয়ে ভারী গলায় বলে, 'কে আগে মরে, কে পরে মরে তার কি ঠিক আছে মা? তোমার মতো পরমায়ু সবাই পাবে, একথাও ভাববার কিছু নেই।'

ছোট শিশুর রাগ দেখলে বড়রা যেমন কৌতুকে হেসে ওঠে, ঘরশোভা তেমনি হেসে উঠে বলেন, 'সাধে কি আর তোকে পায়ে হাত বুলোতে বারণ করেছিলাম রে পুণ্য? মেজাজ তো জানি। জানি হঠাৎ পাটাকে আছড়ে ঠিকরে উঠবি। তোর ভাইদের মেজাজ দেখছিস? ধরে শানে আছড়ে দিলেও রাগতে জানে না।'

'হবে না কেন মা? ভাইরা জানে মা গেলেই চাবিকাঠিটি ওঁদের—'

'ওদের বলে কি ওরা সব নেবে?' ঘরশোভা নির্লিপ্ত গলায় বলেন, 'এমন ছেলে পেটে ধরিনি, বুঝলি? বোনেদের যা দেবার ঠিকই দেবে।'

পুণ্যময়ী ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'তা ছোটভাইদের 'হাত তোলাতেই' বা রেখে দেবে কেন মেয়েদের? যা দেবার নিজের হাতে তুলে দিলেই পার? নগদ টাকাও বাবার ঢের ছিল।'

'আ গেল ! এ ছুঁড়ি যে দেখি আজ ঝগড়া করতেই কোমব বেঁধে এসেছে।' ঘরশোভা সহজ গলায় বলেন, 'চা জল খা, মেজাজের গরম কাটবে। বলি গিন্নীরা সব গেলেন কোথায় ? একবাটি চা দিতে এত দেরী ? অ বড়মানুষেব বেটিবা, কী গো চপ-কাটলেট ভাজছ নাকি ননদের জন্যে ?'

তটস্থ হয়ে সরস্বতী এল জলখাবাবের রেকাবি হাতে, গৌরী এল চা নিয়ে।

'কী এনেছ মেজোবৌমা ? বাজারের সিঙাড়া নিমকি ? বলি ঘরে দু'খানা কিছু করে দিতে পাবলে না ? গতবে এত আগুন ধরেছে ? ব্যাসম গুলে দু'খানা বেগুনী করে দিলেও হতো, সময় সাপেক্ষ ব্যাপাব নয়। অমন ঠ্যালামারা আত্মীয়তা আমাব দু' চোখেব বিষ।'

পুণ্য অপ্রতিভ না হয়ে পাবে না।

ব্যস্ত হয়ে বলে, 'আহা ওকথা বলছ কেন মা ? আমি এ পাড়ার দোকানের খাবার ভালবাসি. তা ওবা জানে বলেই—।'

'নে, কর সুয়োগিরি ভাজেদেব।'

ঘরশোভা টুকটুকে ঠোঁটে একটু কুটকুটে হাসি হাসেন, 'তা বলে মনে করিসনি, আমি মলে ভাজেরা একদিনের জন্যেও এসে দাড়াতে দেবে। যতক্ষণ আমি আছি, ততক্ষণই আদর।'

হ্যাঁ, এইরকম অবলীলাতেই এইরকম টক ঝাল নোনতা বলতে পারেন ঘরশোভা দেবী।

তবে ওঁর মুখের ওপর কথা বলতে গৌরী পাবে। গৌরী নিজেব শাশুড়ীর এহেন অপমানে, অবস্থাকে একটু মোলায়েম করাব চেষ্টায বলে, 'ঠাকুমার তো বেদবেদান্ত, লোক চরিত্র, সমাজ চরিত্র সবই জানা, কিন্তু এটাও তো ভাবতে হয়, আপনার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও সবাই এত খারাপ হবে কেন ?'

'শিক্ষা নিলে তো ?' ঘরশোভা হেসে হেসেই বলেন, 'নিলে উদ্ধার হয়ে যেত, তা তো নয়, যা করে ভয়ে, ভক্তিতে নয়।'

'আমি আপনাকে ভয়-টয় করি না।'

বলে ওঠে গৌরী।

আশ্চর্য, এতবড় দুঃসাহসেও রেগে ওঠেন না ঘরশোভা, তেমনি হেসেই বলেন, 'তা করবি কেন, আমার নাতির সোহাগে যে ধরাকে সরা জ্ঞান করিস।···যা দেখগে দিকিনি তোর শ্বশুররা এসেছে কিনা।'

'এলে তো আগেই এখানে আসতেন', বলে হাসে গৌরী।

তখন আসেনি, একটু পরে এল গৌরীর শ্বশুররা।

এসেই একবার দিদিকে প্রণাম আর মাকে কুশল প্রশ্ন করে চলে গেল হাতমুখ ধুতে।

বয়সে মাত্র বছর দুয়েকের বড় হলেও ঘরশোভার ছেলেরা দিদিকে প্রণাম করে, 'তুমি' করে কথা বলে।

ওদের হাতমুখ ধোওয়ার অবকাশে দুই নাতবৌ এসে দালানের কোণ্ থেকে টেনে টেনে এনে তিন-তিনখানা ভারী টুল ঘরশোভার বিছানার কাছ বরাবর রাখল, আর তার সামনে সামনে একটা করে চৌকি বসাল। টেবিলের বিকল্প। যদিও তিনটে চৌকির তিন রকম মাপ। পুরনো বাড়িতে এখানে সেখানে যা সব ছড়ানো ছিটানো ছিল, তাই থেকে বেছে নিয়ে চম্পাকলি আর গৌরী এই বিকল্পটি আবিষ্কার করেছে। নচেৎ আগে অফিস থেকে ফিরে জলখাবারও খেত ছেলেরা মাটিতে আসন পেতে, সরপোস ঢাকা গেলাসে জল নিয়ে।

আসনগুলো অবশ্য ফুলতোলা কার্পেটের, তবে বিবর্ণ হয়ে গেছে।

ঘরশোভা যখন খুব বুনতে-টুনতে পারতেন তখনকার তৈরি।

তবে এখনও ঘরশোভা শুয়ে শুয়েই মাঝে মাঝে বোনেন। দুটো কাঠি নিয়ে প্রপৌত্রের মোজা সোয়েটার বুনে দিয়েছেন তিনি চম্পাকলির কাছে শিখে। কুরুশের বোনা জানতেন, কাঠি বোনা জানতেন না। একদিন বললেন, 'কী যে দুটো কাঠি নিয়ে ঘুরিস নাতবৌ! দেখে মনে হয় ওর মধ্যে কতই যেন রস।'

'আছেই তো রস,' বড় নাতবৌ হেসেছিল, 'শিখলে বুঝতেন।'

'তবে শেখা—'

বলে হেসেছিলেন ঘরশোভা।

'শেখাব কি, আপনাকে তো আবার ছোঁওয়া বারণ।'

'আলগোছেই শেখাবি। একলব্য যে চোখের আড়ালে বসে ওস্তাদ হয়েছিল।'

রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী-টাহিনী সমস্তই মুখস্থ ঘরশোভার। অথচ নাম সই করতে জানেন না, দলিলে দস্তাবেজে বাড়ি-ভাড়ার রসিদে টিপসই দেন।

তা সেই খেলার ছলেই শিখে নিলেন ঘরশোভা কাঠি বোনা। 'শুয়ে শুয়ে এই কাজটা দিব্যি করা যায়—' বলে কী খুশি!

টুলের ব্যবস্থা হয়ে পর্যন্ত ঘরশোভার ছেলেরাও খুশি। মা'র চোখের সামনে কাছাকাছি বসা যায়।

আসন পেতে খেলে, দালানের ও প্রান্তে বসতে হতো। নইলে ঘরশোভা দেখতে পাবেন কী করে?

হাতমুখ ধুয়ে বসল ছেলেরা। তাদের বৌমারা এল চা জলখাবার নিয়ে।

ঘরশোভা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'তোদেরও বুঝি আজ বাজারের খাবার গেলাচ্ছে? ওসব খেলে শূল বেদনা হয়।'

আসল কথা, আজ পুণ্যময়ী এসে পড়ায় বৌরা তেমন সময় পায়নি, তাই কেনা খাবারেই কাজ চালালো, নইলে ঘরশোভা দু'চক্ষের বিষ দেখেন বলে বাজারের খাবারের দিকে যাবার সাহস নেই বৌদের। বলতে গেলে গিন্নীদের।

পানু তাড়াতাড়ি বলে, 'না মা, অসুখ করবে কেন? বেশ গরম আছে।'

'তোমরা নরম, তাই সিঙাড়া গরম।' বলে হাসেন ঘরশোভা,

'খেয়ে নে, কথা আছে।'

'কী কথা।'

'বললাম যে খেয়ে নে।'

'কী বাবা, কোনো জ্ঞাতি-গুষ্ঠির মৃত্যুখবর নাকি! তেমন হলেই ঘরশোভা ছেলেদের পরিপাটি করে খাইয়ে-দাইয়ে তবে সংবাদটি পরিবেশন করেন।

'ছেলেদের খাওয়া ভাল হলো না'—এই চিন্তায় ঘুম থাকে না ঘরশোভার।

'রাজপুত্তুররা ফিরবেন কখন?'

মা'র এই তীব্র প্রশ্নে সচকিত হয় ছেলেরা। রাজপুত্তুর অর্থে যে তাদের ছেলেরাই সে কথা জানে তারা। কিন্তু ছেলেরা কখন ফিরবে সে কথাটি জানে না। অফিসের ছেলে দুটি যদি বা খানিকটা দেরী করে ফেরে, কলেজের ছেলেটি (যেটি নাকি প্রাণ-বল্লভের) ফেরে অনেক রাত কাটিয়ে।

ঘরশোভার সামনে পড়তে চায় না সে সহজে, কিন্তু মূল দরজাটা তো এই দালানে। যার জন্যে ঘবশোভার ছেলেদের চোর-ডাকাতের ভয়। সিঁড়ি থেকে উঠেই তো দালান। ঢুকলেই দেখা।

তবে ঘরশোভা খুব একটা রাগও করেন না, মুচকে হেসে বলেন, 'কী গো নটবর, বান্ধবীর সঙ্গে ভাবসাব করে, চায়ের দোকানে চা খেয়ে, সিনেমা দেখে, তবে ফেরা হলো?'

'আঃ ঠাকুমা, তুমি যে কী করো?' চিত্তবল্লভ বলে, 'এমন চেঁচিয়ে যা-তা বলো!'

অপ্রতিভ হওয়া ঘরশোভার জন্যে নয়, তাই তিনি সপ্রতিভ গলাতেই বলেন, 'হ্যাঁ, এখন তো চুপি চুপি, আর যখন হাত ধরাধরি করে এসে বলবি—ঠাকুমা, বিয়ে করে এলাম! তখন?'

হাসতে হাসতেই বলেন ঘরশোভা দেবী।

ঘরশোভার রাগ হয় নিজের ছেলেরা দেরীতে এলে। অথবা এসে কোনো দরকারে আগেই নিজের নিজের ঘরে ঢুকলে।

প্রৌঢ় তিন ভাই এক সঙ্গে বসে খাবে, বেশ কিছুক্ষণ মায়ের সঙ্গে কথা বলবে। তবে ছুটি তাদেব।

'কথা আছে' শুনে তোলপাড় মনে খেলে ছেলেরা, তারপব ঘরশোভা কথা পাড়লেন, 'তোদেব বড়দিব কত বয়েস হলো রে?'

ওরা অবাক হয়ে তাকালো।

জগু বলল, 'সে কথা আমাদেব জিগ্যেস কবছ?'

'কবছি তোদেব অবহিত কবতে। পুণ্যি এই যেটেব কোলে তেয়াত্তরে পড়ল। তা বাহাত্তুরে ধবে বসার টাইম হয়ে গেছে কি বল? তা ধরেছে যখন, তখন তেমনি কথাই তো কইবে। তা সামনাসামনিই বলি। আমি মবলে তোবা দিদিদেব ফাঁকি দিবি, এই ভয় ঢুকেছে ওব মাথায়। এই তিন ভাই সাক্ষী, বলে রাখি, কান দিয়ে শোনো—

'আমার যে বাইশ ভবির গোটটা আছে, সেটা তোদেব বড়দি পাবে। আঠারো ভবির অমৃতি বালা জোড়া পাবে মেজদি, আব উনিশ ভরিব টালি ববকি চুড়ি জোড়াটা ছোড়দি। আলো আব দিবুর পুণ্যের চেয়ে যেটুকু কম হলো তা নিয়ে যেন ফ্যাচফ্যাচ করে না। পুণ্য বড়। জ্যেষ্ঠেব—শ্রেষ্ঠ ভাগ। আব বাকি যা গহনা আছে. তোমরা তিন ভাই সমান ভাগে ভাগ কবে নিয়ে নিজ নিজ বৌ মেয়ে আর বৌমাদের ভাগ করে দেবে। শুধু সতুর খোকার বৌয়ের জন্যে আমার গিনির মালাখানা থাকবে। ওটা কারুর সঙ্গে তুল্য-মূল্য করার দরকার নেই। ও আমায় নাতিব বেটার মুখ দেখিয়েছে. ওর দামই আলাদা।'

ছেলেরা স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে মায়ের দিকে। মা'র অনেক গহনা-টহনা আছে। তা তারা জানে, কিন্তু সেই থাকাটা যে এত, তা জানত না। ওরা দরকারে পড়ে বিয়েতে পাওয়া আংটি বোতাম পর্যন্ত বেচে দিয়েছে, কারণ মেয়েছেলের বিয়ে তো দিতে হয়েছে! আর ছেলের বিয়েতে পণ নেওয়াও সম্ভব হয়নি, ঘরশোভার ওতে বড় ঘৃণা।

উনি বলেন, 'মেয়ের বিয়েতে বাবা যা পারবে দেবে, তবে গলায় গামছা মোড়া দিয়ে নগদ নেওয়া কী? ছিঃ, অমানুষের কাজ!'

ঘরশোভার ছেলেরা অমানুষ নয়।

যদিও তাদের মা হরবখতই বলেন, 'অমনিষ্যি।'

স্তব্ধতা ঘুচলে বাজু অস্ফুটে বলে, 'ওই সব ছাড়া আর কি আছে?'

'আছে তো ঢের, সব কি আর আমি মুখস্থ করে রেখেছি? আরো একজোড়া চুড়ি আছে পালিশ পাতের, গলায় বাপের বাড়ি ও শ্বশুরবাড়ি দু'জায়গা মিলিয়ে আছে সীতাহার, পুষ্পহার, ডাম্বাল বিছে, তেঁতুল পাতা, ওপর হাতের তাগা, তাবিজ, বাজু, যশম, নিচের হাতের চুড়ি বালা বাদেও বেরেস্‌লেট্‌, মানতাসা, রুলি।'

একটু ভেবে আবার বলেন, 'এছাড়া রতনচূড় কান ঝাঁপটা, সিঁথি, মাকড়ি, বেলকুঁড়ি, পাশা, আংটি-ফাংটি। রুপোর মধ্যে—চন্দ্রহার, পাঁইজোড়, চরণ পদ্ম। সবই ভারী, তোদের একালের মতো নয়।'

ঘরশোভার যে কত গহনা আছে এই প্রথম সমাজে উচ্চারিত হলো, সব সময় চেপেই রাখেন ঘরশোভা, বাক্স খোলার সময় কাউকে ধারে-কাছে থাকতে দেন না।

ছেলেরা বৌরা কেউই ঠিক মতো জানতেন না, বরং মেয়েরা কিছু জানে। ছেলেবেলায় মাকে সাজতে দেখেছে, পরে নেমন্তন্ন বাড়ি যেতে দেখেছে। তবু এ যুগে যখন একটা আংটি গড়াতে পেরে ওঠা যায় না, তখন এই ফর্দটা যেন অলৌকিক লাগল।

ছেলেরা স্তব্ধ, বৌরা ক্ষুব্ধ।

শুধু—নাতবৌরা চঞ্চল।

চম্পাকলি শ্বশুরের সামনে যতটুকু সম্ভব ততটুকু ঢেউ তুলে বলে, 'তা যাকে যা দেবার আপনিই হাতে করে দিয়ে দিন না ঠাকুরমা। পরে আপনাকে দেখাই। গিনির মালাটা খোকার বৌ এসে পরার আগে আমিই না হয় পরে নিই বেশ কিছুদিন। দিয়ে

দিন, দিয়ে দিন। সিন্দুকের চাবিটা দিন না, বাক্সটা বার করে দিই।'

'ওরে আমার কে রে!'

ঘরশোভা খনখনে গলায় আবার বলে ওঠেন, 'এখন থেকে দিয়ে দিই, তারপর তোরা বুড়িকে টেনে ভাগাড়ে ফেলে দে! এই একশো বছরের বুড়িকে যে ময়রপালঙ্কে শুইয়ে রেখেছিস, সে কি শুধু ভক্তিতে?'

চম্পাকলি থতমত খায়. তুখোর গৌরী বলে ওঠে, 'আপনার ছেলেরা বুঝি এত খারাপ ঠাকুমা?'

'শুধু আমার ছেলে বলে নয় নাতবৌ, পৃথিবীর ধর্ম যা তাই তো হবে?'

তবে আর কি।

পৃথিবীর ধর্মের ওপর তো আর কথা চলে না?

শুধু—রাজুরা আর তাদের বৌরা ভাবতে থাকে, পৃথিবীর কি অদ্ভুত খেলা! বাড়িতে এত সোনা, আর আমরা—

ঘরশোভা আবার একটু হাঁফ ফেলে বলেন, 'দেখো বাছা, যেন আমার কথার এতটুকু এদিক ওদিক না হয়?'

পুণ্যময়ী এতক্ষণ গুম হয়ে বসেইছিল, এখন হঠাৎ বলে ওঠে, 'তা তুমি তো একটু লিখে রাখলেই পারো মা, কে কখন ভুলে যায় —।'

'ভুলে যাবে? ভুলে যাবে মানে? আমার কথা ভুলে যাবে? তিন ভাইয়ে একসঙ্গে শুনলি তো? নড়চড় না হয়। অবিশ্যি বাজারে যা খুচরো-খাচরা ধার আছে, সে সব শুধে তবে মরব। ধারে কর্জে ডুবিয়ে তোদের রাখব না আমি। যা পুণ্যি, এবার ভাজেদের সঙ্গে গপ্পো করগে যা। গপ্পো আর কি, মা শাশুড়ীর নিন্দে। এখন ননদ ভাজে মায়ের মুণ্ডুপাত করগে।'

'আমরা ননদ ভাজে তোমার নিন্দে করি মা?' আহত চোখ তুলে তাকায় পুণ্য।

ঘরশোভা নির্লিপ্ত গলায় বলেন, 'বুকে হাত দিয়ে বল, করিস

কিনা। জমিয়ে বসে বলিস কিনা—মা'র এই অন্যায়, মা'র এই দোষ, মা'র এত জেদ।'

বৌমারা এবং মেয়ে, যাকে বলে পাথরের মূর্তি হয়ে যায়। আশ্চর্য হয়ে ভাবে, ঘরশোভা এসব জানলেন কি করে? ঘরশোভার কানের কাছে তো বলতে যায়নি? আর উনিও কিছু উঠে গিয়ে আঁড়ি পাতেননি, তবে?

ঘরশোভা কি হাত গোনেন?

ঘরশোভা কি 'থট-রীডার'?

মাঝে মাঝে তাই মনে হয় যেন। যেন অপরের মনের মধ্যে টর্চ ফেলে সব দেখে ফেলেছেন।

অনেকক্ষণ পরে জগু সাহস করে বলে, 'কিন্তু নগদ টাকা কি কিছুই নেই মা?'

ঘরশোভা তিনটে পান একে একে ছেলেদের হাতে আলগোছে ফেলে দিয়ে নিজে আর একটা খেয়ে হেসে বলেন, 'সব কথা প্রকাশ করব কেন রে? মরে যাবার পরে তাহলে মায়ের বদলে নতুন কী পাবি? বুঝি, তোদের এখন খুব অভাব, কিন্তু কলসীর জল তো? ঢাললে কতক্ষণ? যা আছে সব যদি এখনই তোদের হাতে তুলে দিই, তাহলে মরার পর লোকে বলবে কী, এত-বড় একটা মান্যিগণ্যি লোকের পরিবার ছিলাম, সে মান-মর্যাদাটা তো রাখতে হবে? পাঁচজনে যখন শুধোবে 'মা কী রেখে গেছে?' তখন কী জবাব দিবি? আমি মলে তখন তো সবই তোদের।'

সব কথায় ওই কথাটিই বলেন ঘরশোভা, 'আমি মলে তখন খ কোরো! শখ সাধ কোরো। মলে তো সবই তোদের।'

বৌরা এতে ভীষণ চটে যায়, কিন্তু কী করবে? স্পষ্টবক্তা বশোভা যা বলবার তা বলবেনই।

'নগদ টাকা তোমার দৌত্তুর সন্তানরা কিছুই পাবে না মা?'

না বলে পারে না পুণ্য।

ঘরশোভা মেয়ের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলেন, 'হক্ কথা

বলছি বাছা, দৌত্তুরদের ওপর আমার চিত্ত চটা। ছোঁড়ারা তো হু'বেলা মনে মনে বুড়িকে গঙ্গাযাত্রা করাচ্ছে। সাতজন্মে একবার দেখতে আসে না। কিসে চিত্ত থাকবে?'

পুণ্যময়ী কেঁপে ওঠে।

সত্যিই কি মা অন্তর্যামী নাকি?

তার ছেলেরা তো বলেই ও কথা। যখন তখনই বলে, 'তোমার মা কি সত্যিই অমর বর পেয়েছে মা! মরার নামটি নেই? মলে একবার দেখি তোমার বাবা বুড়ো কী রেখে গিয়েছিল।'

আর যদি কখনো পুণ্য ছেলেদের বলে, 'যা না একবার মাকে দেখে আয় না?'

ছেলেরা করজোড়ে বলে, 'রক্ষে দাও মা, গিয়ে তো সেই অনন্তকালের দৃশ্যটিই দেখতে হবে? তিন হাত উঁচু ময়ূরপঙ্খী পালঙ্কে ধবধবে বিছানায় পা জড়িয়ে শুয়ে আছেন গিন্নী, পান জর্দা খাচ্ছেন আর ডাবর নিয়ে নিয়ে পিক ফেলছেন। অসহ্য! যেদিন শুনব তোমার মা মরেছে, সেদিন যাব।'

অথচ ঘরশোভা কিছু আর ঘরশোভার দৌহিত্রদের জীবনযাত্রায় কোনো কিছু ঘটাচ্ছেন না। তাদের কানাকড়ি খরচাও করাচ্ছেন না।

তবু এমনিই হয়, কেউ যদি একটু বেশিদিন পৃথিবীর অন্নজলের উপসত্বে ভাগ বসায়, তাহলে অন্য পাঁচজনের চোখ টাটায়, কেবলই বিস্ময় প্রকাশ করে বলে, 'বাবাঃ, এখনো মরেনি?' বলে, 'কী আশ্চর্য! কবে মরবে?'

যেন ওই মৃত্যুটার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পৃথিবীটা হালকা হয়ে যাবে।

কিন্তু ঘরশোভা কি মরবেন?

ক্রমশঃ ওঁর বাড়ির লোকেদেরও সন্দেহ হচ্ছে, উনি বোধহয় অলৌকিক কোনো শক্তি পেয়েছেন। তাই এখনো বাঁধানো দাঁতে জগতের যাবতীয় বস্তুতে দাঁত বসাচ্ছেন, সব কিছু হজম করছেন,

বহাল তবিয়তে বিরাজ করছেন।

এখনো পাকাচুলের নুড়ি খোঁপায় কর্তার আদর করে গড়িয়ে দেওয়া ছোট ছোট দুটি সোনার কাঁটা গুঁজছেন, বিছানায় শুয়ে শুয়েই আধ ঘণ্টা ধরে তেল মেখে চান করছেন, বাজারের বেলায় অনন্তকে ডেকে বলছেন, 'মেথি শাক ওঠেনি রে অনন্ত? আর কচি কড়াইশুঁটি? কচি কচি কড়াইশুঁটি দিয়ে মেথি শাক চচ্চড়ি রাঁধতে পারলে, টাকায় তোলা।'···বলেন, 'আর শোন, মোচা আসেনি কতকাল? খেয়াল করে আনবি।'

মলিনাকে ডেকে বলেন, 'দুটি ছোলার ডাল দিয়ে দাও তো বড়বৌমা, ওবেলা আর লুচি পরোটা খাব না, দুধ-মিষ্টি খাব, তার সঙ্গে খানকতক ওই ধোকাভাজা।···ভিজোবে তো বেশি করেই চারটি ভিজিও বরং, তোমাদের দিকে ধোকার ডালনা কোরো। জগু ভালবাসে।'

আবার শুয়ে শুয়ে কড়িকাঠের পানে তাকিয়ে তাকিয়ে বলেন, 'কত ঝুল জমেছে। অনন্তকে ডেকে একবার সঙ্গে করে করিয়ে নাও না বৌমা, ঝুলকালি নোংরা বাড়তে দিলে মা-লক্ষ্মী ছেড়ে যান।'··· কোনো সময় বা স্বগতোক্তি করেন, 'কর্তা গিয়ে পর্যন্ত আর বাড়ির গায়ে মিস্তিরির হাত পড়ল না। কোনো ক্ষমতা নেইগা! কী ছেলেই গর্ভে ধরেছি, মেয়েমানুষের অধম। কেবল মুখ শুকিয়ে বসে থাকতে জানে, পয়সা কোথায় ছড়ানো আছে খুঁজে দেখতে জানে না।'

কোনো কোনো সময় আবার তীব্র চীৎকারে সবাইকে সচকিত করে তোলেন, 'ওগো বৌমারা। কাল না 'চন্দর গেরোন' গেল? তোমাদের ওই জলের জালা অঙ্গ নিয়ে বসে রয়েছে যে? গেরোন লাগলে হাঁড়িকুঁড়ি কলসী কুঁজো ফেলে দিতে হয়, তাও জানো না? তিরিশ বত্রিশ বছর তো—এসেছ এ সংসারে, এখনো রপ্ত হলো না?'

দালানের এক কোণে শ্যাওলাধরা একটা ভারী টুলের ওপর মাঝারি সাইজের একটা জলের জালা বসানো থাকে। সেটা হলো ইতর সাধারণের জন্যে, ছেলেপুলেরা রাতদিন জল চায়, কে কত

দেবে ভাঁড়ারের কলসী কুঁজো থেকে ? ওটা থেকে ওরা গেলাস ডুবিয়ে ডুবিয়ে খায়।

কিন্তু বছরে তো—ত্বু' একবার গ্রহণ লাগছেই, তাছাড়া—সাতপুরুষের এদিক ওদিক জ্ঞাতিও আছে বিস্তর, যারা মরলে কুঁজো কলসী ফেলতে হয়। কত আর ফেল্‌তে পারা যায় ? একটি ওই মাঝারি জালারও তো দাম কম নয় ?

মেজো বৌ সরস্বতী একটু তার্কিক আছে, সে এসে বলে, 'আচ্ছা মা, আকাশের চাঁদে গ্রহণ লাগল তো ঘরের মধ্যে জলের পাত্র কী দোষ করল ?'

ঘরশোভা বিরক্ত গলায় বলেন, 'আমি তোমাব সঙ্গে শাস্তর আলোচনা করতে বসতে পারব না মেজো বৌমা, যা করে এসেছি, তাই করব। যা হয়ে এসেছে, তাই হবে। আমি যতক্ষণ আছি, কিছু রদবদল হবে না, ব্যস।'

যারা সামনে থাকে, তাদের মুখে আসে, 'তুমি তো চিরকালই আছ। আমাদেরই বারোটা বেজে আসছে।'

মুখে এনেও বলে না।

আস্ত জালাটা ফেলে দেবার অর্ডার দেয়।

পাঁজিপুঁথি দেখেন না ঘরশোভা, তবু কেমন করেই যেন জানতে পারেন, চন্দ্র সূর্য কখন্ কোনখানে অবস্থান করে। বৌদের ডেকে ডেকে বলেন, 'আসছে কাল থেকে ইতুপুজো, মনে আছে তো বৌমা ? মেয়েদের সব্বাইয়ের নামে নামে ঘট দিও।'

বলেন, 'বোশেখ মাসের তো আজ সংক্রান্তি, কাল সকালে যেন আবার তোমাদের বৌ-ঝিরা সাত-সকালে চা খেতে বসে যায় না, জয়মঙ্গলবারের কথা শুনে তবে জল খাবে।'

ষষ্ঠী মনসা, মঙ্গলচণ্ডী, ইতু, সবকিছু করানো চাই সবাইকে। নিজেও অবশ্য আছেন সে দলে।

মুখরুচি করে ব্রতের পারুনির ব্যবস্থা চলে।

আশ্চর্য ! যা ইচ্ছে খেয়েও অসুখ করে না ঘরশোভার। 'ওমা,

সেব থাক, আপনার অসুখ করবে।' ওকথা বলার উপায় নেই বৌদের।

তাই নিজ নিজ স্বামীপুত্রের কাছে বলে, 'আমাদের এখুনি জগতের অর্ধেক খাদ্য হজম হয় না, মা যে কী করে সব খেয়েদেয়ে হজম করেন!'

পুরুষমানুষরা অবশ্য এধরনের আলোচনা পছন্দ করে না। কেউ বলে, 'ওইটুকুই ভগবানের আশীর্বাদ।' কেউ বলে, 'যার যা সইবে, খাবে, এর মধ্যে কথা কী আছে?'

কিন্তু কথা আছে বৈ কি।

যেটাকে মনে হয় বাড়তি, অবান্তর, অহেতুক, সেটা জোগান দিতে বিরক্তি না এসে পারে না যে। একটা মানুষ নব্বুই বছর ধরে খেয়ে আসছে, তবু খাওয়ার আকর্ষণ কমে না, এ কী রকম!

ঘরশোভার ছেলেমেয়েরা ক্রমশ বুড়ো হয়ে যাচ্ছে, নাতিরা কর্তাব্যক্তি হয়ে উঠছে, নাতনীরা একে একে শ্বশুরবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

ঘরশোভার কোনো তারতম্য নেই।

সেই পাকা আমটির মতো চেহারা, সেই পরিপাটি করে চুলটি আঁচড়ানো, সেই ফরসা ধবধবে থান সেমিজ। পা থেকে কোমর পর্যন্ত একখানা কাঁথায় ঢেকে রাখেন, সে কাঁথার কাজের কাছে ঢাকাই শাড়ি হার মানে।

কাঁথা ঘরশোভার নিজের হাতের তৈরী। তিন ছেলের আর কর্তার জন্যে চারখানা অতি উত্তম কাঁথা তিনি বানিয়েছিলেন একদা। কর্তা গেলে নিজেই ব্যবহার করছেন সেটা। দে, ওটাই আমার গায়ে দিয়ে দে। কর্তার গায়ের হাওয়া লেগে আছে ওতে।'

তখন নাতিদের বিয়ে হয়নি, বড় নাতনী ছিল বাড়িতে। মুচকে হেসে বলেছিল, 'তোমাদের দুজনের খুব ভালবাসাবাসি ছিল, না ঠাকুরমা?'

ঘরশোভাও হেসেছিলেন, 'তোমাদের আমলের মতন ভালবাসা-

বাসি নয় গো সুন্দরী, সে অন্য বস্তু। দশ বছর বয়সে এ সংসারে এসে ঢুকেছিলাম, তখন বরের নামে ভয় পেতাম, ঘরে শুতে পাঠালে কেঁদেকেটে পালিয়ে আসতাম, শেষে আবার সেই মানুষই ঠাকুর দেবতার মতো হয়ে গেল। ভালবাসা দেখানো-টেখানো জানতাম না, গায়ে গা দিয়ে বসতেও দেখেনি কেউ জন্ম-জীবনে, সমুখে কখনো খেতে বসিনি, তবু দুজনে দুজনের কাছে যেন আয়নার মতো। একের মধ্যে অপরের মনপ্রাণ সব স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। সে তোরা বুঝবি না দিদি। তোরা জানিস, বায়োস্কোপ না দেখালে ভালবাসা প্রকাশ হয় না, রাতদিন গলাগলি না হলে ভালবাসা জাহির হয় না।'

'আর তোমরাও জানতে, গয়না না দিলে ভালবাসা জানানো যায় না।' বলছিল নাতনী।

'ওলো সে আলাদা। প্রাণপাত করে দিতে পারার সুখে দিয়েছে। ভালবাসার মানুষকে সাজিয়ে সুখ।'

এখন নাতবৌরা বলে, 'আপনার একশো বছরের ইতিহাস জমা আছে ঠাকুমা, খাতা কলম নিয়ে বসব? আপনি বলবেন আর আমরা লিখে নেব।'

'নিয়ে কি করবি?'

'কাগজে ছাপাব!'

'শোন কথা—', ঘরশোভা হাসেন। 'আমি আবার কে একটা দশমান্যি মানুষ যে কাগজ ছাপবে। হ্যাঁ, বিদ্যাসাগরের মতন ছেলে পেটে ধরতাম, তাহলে সে দাবী-দাওয়া থাকত।'

ওরা বলে, 'তা হোক, তখনকার নিয়ম-কানুন, আগের ব্যবহার সে সব তো আজ আর আমরা কেউ জানিই না, শুনব।'

'দূর দূর! সে কোন্ জন্মের কথা, ভুলেই গেছি।'

এ আসরে প্রায়শই নিত্যবল্লভ থাকে, সে হেসে বলে, 'তুমি

আবার ভুলে গেছ বুড়ি! তোমার ক'খানা গয়না আছে, ক'টা আংটি আছে, তা ভোলনি, মুখস্থ করে রেখেছ—'

ঘরশোভা একটু অন্যমনস্ক গলায় বলেন, 'ওসব কি শুধুই গয়না রে নিতু, ওর এক একটির অঙ্গে এক একটি ঘটনা জড়ানো আছে। ওই যে অমৃতিবালার কথা বললাম সেদিন? ওটা আমার প্রথমবার সাধে পাওয়া, বাবা গড়িয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আর ওই পাটি হার, তোদের ঠাকুর্দার প্রথম উপহার।'

নাতবৌরা বলে, 'কেবল গয়নার গল্পই শুনি ঠাকুমা, চোখে তো দেখলাম না কোনোদিন।'

'দেখবি, দেখবি, আমি মরি আগে।'

ওরা মুখ চাওয়াচায়ি করে হাসে। ভাবটা হচ্ছে—তুমি আর মরছ বুড়ি!

সত্যি, প্রপৌত্রটা পর্যন্ত স্কুলের উঁচু ক্লাশে উঠে পড়ল।

ঘরশোভা অমর, অজর, অক্ষয়।

বড় বৌ মলিনা, বাতে প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়েছে, সকালে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না, সরস্বতীরও ঘুষঘুষে জ্বর ধরেছে, ওর সকালে স্নান বারণ, পঙ্কজিনী একা পড়ে গেছে, তাই সকাল থেকেই তাকে রান্নাঘরে গিয়ে লাগতে হয়। বামুন ঠাকুর ভক্তিনাথটাও তো বুড়ো থপ্‌থপে হয়ে গেছে। কাজ করে যত, চেঁচায় তার তিন গুণ। কাজেই ওকে সাহায্য না করলে চলে না।

অতএব এখন সকালবেলা বঁটি আর কুটনোর ঝুড়ি নিয়ে বসার ভার চম্পাকলি আর গৌরীর।

বঁটি, বারকোস, জলের গামলা সব নিয়ে বসে ওরা হাঁক দেয়, 'ও ঠাকুমা, বলুন কী কুটব?'

ঘরশোভা মাথাটা এগিয়ে নিয়ে বলেন, 'তরকারি আনাজ কী আছে দেখি—'

দেখে আজকাল আর কিছুতেই মনঃপূত হয় না ঘরশোভার, তেতো গলায় বলেন, 'বাজার কে করেছে রে? কী ছিরির বাজার!

এই দিয়ে ষেটেব এই সমগ্র সংসারের দুবেলা সম্পত্তি হবে ?·· বলি দিন দিন সবাই এত কেপ্পন হয়ে যাচ্ছে কেন বল দিকি ? কেপ্পনি আমাব দু' চক্ষের বিষ। খাওয়া-দাওয়াটা ভাল না হলে শরীরে গত্তি লাগবে কিসে ?'

অভাবের দাঁত ক্রমশই ধাবালো হয়ে উঠেছে, তাই বৌদেব কথাও ধাবালো হয়ে উঠেছে। পঙ্কজিনী কোথা থেকে যেন শুনতে পেয়ে বলে, 'বেশি গত্তি লেগে আব কী হবে মা ? আপনার মতন অখণ্ড পরমায়ু পাব ? অতিবড় শত্তুরেবও যেন এমন না হয়।'

ঘবশোভা কটু গলায় বলেন, 'কেন ? কেন, শুনি ? আমার কিসের কষ্ট যে, অতিবড শত্তুবেব জন্যেও আমাব অবস্থা কামনা কবো না ? দীর্ঘ আয়ু তো প্রার্থনাব কথা। আশীবাদ কবতে লোকে বলে —'দীর্ঘায়ু হও!'

'মেয়েমানুষকে বলে না বোধ হয়।'

'কেন, মেয়েমানুষেব জন্যে আলাদা ব্যবস্থা কেন ?' ঘবশোভা রেগে বলেন, 'এদিকে তো মুখে বলিস—আমাদেব কাছে মেয়েছেলে দুই-ই সমান।—পেটে এক মুখে এক তোদের। আমি অত 'মবি মরি' করি না। মবলেই তো আবাব মাতৃজঠরে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে! তাব চেয়ে এ ভাল। হরিনাম শুনছি, ক্ষীর ছানা মাখন মিছরি খাচ্ছি, পালঙ্কে অঙ্গ ঢেলে পড়ে আছি। মন্দটা কি আছি ?'

পঙ্কজিনী কটকটিয়ে বলে, 'আপনি কোন্ দুঃখে মন্দ থাকতে যাবেন মা ? সে থাকব আমরা।'

ঘরশোভা অম্লান বদনে বলেন, 'তা যার যেমন কর্ম করা আছে, সেইমতো তো ফল পাবে ? ভাগ্যে থাকলে তোমরা ওই মুখ্যু-সুখ্যু স্বামী নিয়েই গাড়ি পাল্কী চড়তে, সোনাদানা গায়ে দিতে, মণ্ডা-মেঠাই খেতে। আমি কী মানুষের হাতে পড়েছিলাম! বিত্তের মধ্যে তিনটি ক্লাশের পড়া, তারপর থেকেই তো বাপের গদি দেখছে।'

পঙ্কজিনীও ছেড়ে কথা কয় না, বলে, 'তা সেই গদিওলা শ্বশুরেরই

বা কী পেলাম আমরা ?'

ঘরশোভা এবার রেগে যান, বলেন, 'বেইমানের মতন কথা বোল না ছোট বৌমা, এখনো তাঁর তৈরি বাড়িতে নাতি-পুতি নিয়ে ঘর করছ।...ও কি রকম ঝোলের কুটনো হচ্ছে নাতবৌ! গুটি গুটি আলু, সরু সরু পটল ? লম্বা লম্বা নৈনিতাল আলু, ফালাফালা করে না দিলে কখনো ঝোলের সোয়াদ হয় ?'

গৌরী বলে, 'এতো মাছের ঝোল ঠাকুমা! এতে সোয়াদ না এলে আপনার কী ? আপনার ঝালের ঝোলে আলু কুটব ফালাফালা করে।'

'আ মলো ছুঁড়ি, মাছের ঝোল আমার ছেলেরা খাবে না ? নাতি-পুতিরা খাবে না ?'

'তা কুলোনো তো চাই ?'

গৌরী আবার বলে, 'আর ওসব লম্বা লম্বা চলবে না ঠাকুমা। এখন সব ছোটর যুগ।'

ঘরশোভা বেজার গলায় বলেন, 'তা যা বলেছিস, জিনিস ছোট, মন ছোট, নজর ছোট, বুদ্ধি ছোট। তোদের এই কালকে দেখলে ঘেন্না আসে।'

পঙ্কজিনী শুনতে পেলে হয়তো বলত, 'চার কাল বেঁচে থাকলে অনেক রকমই দেখতে হয় মা।'

শুনতে পায়নি তাই।

মলিনা কখনও কখনও বলে, 'মাকে অমন কটকট করে বলিস কেন ছোটবৌ! যতই হোক গুরুজন।'

পঙ্কজিনী বলে, 'আর পারা যায় না দিদি। পৃথিবীতে যে আর কোনো দৃশ্য আছে তা ভুলে গেছি। দিনেরাতে ওই এক দৃশ্য দেখতে দেখতে আমারও ঘেন্না ধরে গেছে। মা'র ছেলেদের বলে আবার ওঁকে ঘরে ঢোকালে বাঁচা যেত।'

'আর ঘরে!'

মলিনা বলে, 'সত্যিই তো আর আরো দশ বছর বাঁচবেন না!'

'বিশ্বাস কী, আমাদের সবাইকে খেয়ে তবে উনি যাবেন।'

পঙ্কজিনীর স্বামী প্রাণবল্লভের হাই ব্লাড্ প্রেসার, একবার হাট অ্যাটাকও হয়ে গেছে, মনে-প্রাণে তার সর্বদাই জ্বালা।

এর মাঝখানে আবার ঘরশোভা সেই ছেলেকেই ডেকে বলেন, 'তোর ওই ছোট মেয়েটাও তো হাতী হয়ে উঠল পানু। পাত্তর দেখছিস!'

পানুর মধ্যেও আজকাল একটু অসহিষ্ণুতা দেখা দিয়েছে। তাই সে বলে ওঠে, 'দেখে কী করব! পয়সা থাকলে তো মেয়ের বিয়ে দেবো!'

ঘরশোভা গম্ভীর হয়ে যান, বলেন, 'তোমার পয়সা নেই সেটা তোমার অক্ষ্যামতা, তাতে তোমার সাত খুন মাপ হবে, এমন আশা কেন! মেয়েকে বিয়ের বয়সে বিয়ে দিবি না! 'আমার পয়সা নেই দেবো কোথা থেকে' বলে বসে থাকবি?'

পানু গম্ভীর ভাবে বলে, 'তবে কি করব বলো, চুরি-ডাকাতি করব?'

'দরকার পড়লে তাও করতে হয় পানু, বাপ হওয়া অমনি না। নচেৎ পাত্তরের বাবার হাতে-পায়ে পড়গে।'

ছেলে মাথা নিচু করে, বৌ অগ্নিদৃষ্টি হানে, ঘরশোভা দেবী নির্লিপ্ত গলায় ডাক দেন, 'সুহাস, অ সুহাস, আজ আমায় ক'টা পান দিয়েছিলি? এক্ষুনি কেন পান ফুরলো!'

পাকা চুলে নুড়ি বাঁধা সুহাস মাজায় হাত দিয়ে এসে দাঁড়ায়, বলে, 'যা ছিল তাই সেজেছি মা, আট আনা করে পানের গোছ হয়েছে—'

'তবে কাল থেকে আর পান সাজিসনি', ঘরশোভা বলেন, 'কেপ্পনির মধ্যে আমি নেই, হয় খাব নয় খাব না। বৌদিদিদের বলিস, মায়ের বরাদ্দয় কাঁচি চালালে লক্ষ্মী ছেড়ে যায়, এই কথাটা যেন চিন্তা করে।'

যে পানু এইমাত্র মাথা হেঁট করে বসেছিল, সে উঠে গিয়ে

ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'মায়ের পানের পয়সা ছাঁটবার দুর্মতি কার হয়েছে? সংসারের—আর যার যা হোক, মা'র যেন এদিক ওদিক না হয় তা বলে রাখছি।'

পান্নুর বৌ কেমন একরকম ঈর্ষার দৃষ্টিতে অদূরবর্তিনীর দিকে তাকায়, তারাও ছেলের মা। তারাও প্রাণ ঢেলে ছেলে মানুষ করছে, তাদের ছেলেদের মধ্যে এই আনুগত্য, এই ভক্তি, এই ভালবাসা কোথায়?

বরং তারা কথায় কথায় মাকে ডাউন করতে পেলে ছাড়ে না। এই অভাবগ্রস্ত সংসারে ছেলেদের সদাই অসন্তোষ।

বাড়িটা ক্রমশই জীর্ণ হয়ে আসছে, অতি পরিচিত শ্রীহীন বর্ণহীন আসবাবপত্রগুলো যেন সর্বদা বুকের ওপর পাষাণ ভার চাপিয়ে রেখেছে, মনের মতো জামা জুতো হচ্ছে না। খাওয়া-দাওয়া ক্রমেই খারাপ হয়ে আসছে, কমবয়সী ছেলেমেয়েদের এই অবস্থাটায় ভাল লাগবার কথাও নয়। মায়ের প্রাণ বোঝে সেটা, তাই আড়ালে ওদের একমাত্র কথা, 'সংসারের সব সারটুকু একজনের ভাগেই যাচ্ছে, কী করব বল্ বাবা!'

সত্যি, একটা মানুষকে রাজার আদরে ময়ূরপঙ্খী পালঙ্কে শুইয়ে রাখতে হলে যে কত লাগে, তা সে যাদের রাখতে হয় তারাই জানে। সংসারের আর সকলের ভাগেই টান পড়ে।

'তাছাড়া—এই বাজারে তিনটে মানুষ পোষা!'

একথা বার বার ওঠে।

তিনটেই তো বুড়ো হয়ে গেছে, কাজই বা পাওয়া যায় কতটুকু?

পঙ্কজিনী রেগে রেগে বলে, 'বামুন ঠাকুরের পেছনে আমাকে যা খাটতে হয়, তার থেকে রান্না করা ভাল। শুধু শুধু একটা বোঝা টানা। আর অভ্যেসগুলিকে মা করে দিয়েছেন নবাবী। পান সুপুরি চাই, চারবার করে চা চাই, রাতে ভাত চাই। বামুন ঠাকুর না ভাশুর ঠাকুর। আর ওই সুহাসটি, এখন তো মা'র কাজটুকু

ছাড়া গেরস্তর কিছুই করে উঠতে পারে না। ঠিকে-ঝি সুবর্ণর মাকে ক্রমান্বয়েই কাজ বাড়িয়ে দিতে হচ্ছে। আর মাইনে বাড়াতে হচ্ছে।

অনন্তর মুরুব্বিয়ানাও অসহ্য লাগে ওদের। সিঁড়ির তলাটা তো ওর দখলে, বিছানা মাদুর ময়লা চিট্ গামছা, হুঁকো কল্‌কে, এই সব নিয়ে নরককুণ্ডু করে রেখেছে বুড়ো। ছেলেপুলেদের ওপর কী শাসন চালাতে আসে। যেন বাড়ির লোক!

কার ভাল লাগে?

এই তিন-তিনটে অকালকুষ্মাণ্ডকে পোষা শুধু ঘরশোভা দেবীর জন্যেই তো! ওদের ছাড়ানোর কথা তো ওঁর সামনে তোলবার জো নেই।

অবিশ্যি সুহাসিনীকে ছাড়ানো চলে না, ভাঙা কোমর নিয়ে সব কিছু করছে। সেটা আর কে করবে? ঘরশোভা তো আর মরবেন না!

তবু নিত্য একদিন মনের জোর করে গিয়ে বলে বসল, 'ও বুড়ি, দিনকাল তো দেখছ, তিন-তিনটে লোককে আর কত দিন পোষা যাবে? ঠাকুর আর অনন্ত তো প্রায় কোনো কর্মেই লাগে না। প্র্যাকটিক্যালি রান্নাটান্না তো ছোট কাকী—আর তোমার নাত-বৌরাই করে। আর বাজার করা? সে আমরা অনায়াসেই করে দিতে পারি। বরং অনন্তর মতো পয়সা মারব না। বুড়ো হয়ে গেল তবু ওই রোগটি তো গেল না।'

ঘরশোভা কনুইয়ে চাপ দিয়ে খাড়া হয়ে উঠে বসে বললেন, 'কাদের ছাড়ানোর কথা বলছিস?'

'কাদের আর, ওই ঠাকুর-চাকরের কথাই বলছি—'

ঘরশোভা অবাক হয়ে বলেন, 'ওদের ছাড়ানোর কথা বলছিস? তোর জন্মের আগে থেকে ওরা আছে তা শুনিসনি কোনোদিন?'

'শুনব না কেন? কিন্তু এখন আর ওদের কাছ থেকে কী কাজ পাওয়া যাচ্ছে?'

ঘরশোভা আবার শুয়ে পড়ে বলেন, 'আমাকে দিয়েও তো কোনো কাজ পাওয়া যায় না। তবে আমায় টেনে ফেলে দে।'

'সেটা তো আর একটা কথা হলো না, ওরা মাইনে-করা লোক—'

ঘরশোভা তীক্ষ্ণ গলায় বলে ওঠেন, 'ওরা যে মাইনে-করা লোক, সেকথা তোদের এখনো মনে আছে? ধন্যবাদ! কিন্তু সে মাইনে তোরা কেউ—কোনো দিন দিয়েছিস? বাড়ি ভাড়ার টাকা থেকে হচ্ছে না?'

'মাইনে ছাড়াও খরচ হচ্ছে তো বুড়ি! দেখছ তো বাজার?'

ঘরশোভা তীব্র স্বরে বলেন, 'দেখছি বৈ কি। সবই দেখছি। একটা পুরুষের ক্ষ্যামতায় তিনটে লোক পুষে, তিন-তিনটে মেয়ের বিয়ে আর ওই বৃহৎ সংসারকে রাজার হালে রেখেও কোঠাবালাখানা বানানো হয়েছে, আর তোদের বাপ-বেটাতে মিলে দুটা বেটাছেলের মুরোদে ভাতের ওপর মাছ জোটে না। ওদের ছাড়াবার কথা আর কোনোদিন আমার সামনে বলিসনি বলে দিচ্ছি।'

অপমানে চোখ মুখ লাল হয়ে গেলেও সেই অপমানটাই ঝেড়ে ফেলবার জন্যে নিত্য একটু কড়া হাসি হেসে বলে, 'ঠিক আছে, তবে কিন্তু বলে রাখছি—তোমার চিতায় ওই তিনটেকে তুলে দেবো।'

'দিবি তা জানি। মা-বাপ বুড়ো হলেও আপদ বালাই ভাবিস তোরা। তবে জগতের সার কথা, শুনে রাখ—ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে। গোবর, তোমারও এদিন আছে।'

ঘরশোভার মেয়ে-বৌরা ভেবে পায় না, যাকে যা-খুশি বলার সাহস মা পান কোথায়!

কাটিহার থেকে দিব্যময়ী এল একবার কলকাতায় ভাগ্নের বিয়েতে। এসে মাকে দেখে ছলছল চোখে বলল, 'সাত বছর আগে যে অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছি, ঠিক তেমনি দেখছি, অহরহ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি মা, তিনি যেন তাড়াতাড়ি তোমায় কোলে তুলে নেন।'

ঘরশোভা তাঁর সেই ছুরিকাটা মুখটা কুঁচকে বলেন, 'কেন ? ভগবানের কাছে আর কোনো প্রার্থনা নেই তোমার ? স্বামী-পুত্তুরের আয় উন্নতির প্রার্থনা করগে বাছা, মায়ের জন্যে আর প্রার্থনা করতে হবে না।'

মেয়ে অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে যায়।

ঘরশোভা হাঁক ছাড়েন, 'নাতবৌ, অ নাতবৌ, বাজারে আজ ইলিশ মাছ আনতে দে। ছোট পিস্‌-শাউড়ি ইলিশ ভালবাসে।'

এই ভাবেই চালিয়ে যাচ্ছেন ঘরশোভা।

দিব্যও যাবার আগে একবার কথাটা তুলল, 'দিদি বলছিল, তুমি না কি তোমার গহনা-টহনা ভাগ করে দিচ্ছ, তা আমাকে যেটা দেবে, দিয়েই দাও না-হয়। আমার তো এই পাঁচ-সাত বছরে আসা—'

ঘরশোভা হঠাৎ ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন, 'সব শেয়ালের এক রা। গয়নাগাঁটি কিছু নেই আমার যাঃ।'

চলে যাবার সময় দিব্য ভাইদের কাছে বলে, 'মায়ের কপালে এখনো অশেষ ভোগান্তি আছে মনে হচ্ছে। একশো বছরই পার করবেন উনি।'

তারপর হিসেব হয়, আর কত বাকি আছে তার ?

আর চারটে বছর পার করলেই নাকি—

কিন্তু সেই চারটে বছর আর পার করলেন না ঘরশোভা। দিব্য যেদিন চলে গেল তার পরদিনই হঠাৎ মাঝরাত্রে একটা তীব্র চীৎকার করে উঠলেন ঘরশোভা, 'নিয়ে গেল, নিয়ে গেল, সব নিয়ে গেল।'

ধড়মড় করে উঠে এল সবাই, মাকে দেখার আগে দরজাগুলো দেখল, লোহার সিন্দুকের দরজা দেখল, তারপর বলল, 'মা, স্বপ্ন দেখছিলে ?'

'স্বপ্ন ?'

ঘরশোভা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'তাই বল! ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল।'

সত্য বলল, 'এখনো তুমি বিষয়-চিন্তা কর কেন ঠাকুমা? ভগবানেব নাম করে ঘুমোবে।'

ঘরশোভা বড় নাতির দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলেন, 'করি বৈকি। রোজই তাঁকে জিগ্যেস কবে শুই, ভগবান, কবে এদেব ছুটি দেবে?'

শুনে সবাই চমকে উঠল।

ঘরশোভার মুখে এ ধরনের কথা এই প্রথম।

তবে কি সত্যিই এবার দিন ফুরোবার আশা হবেই?

সত্য একটু কাছাকাছি গিয়ে বলে, 'আমাদের ছুটির কথা কে বলছে গো বুড়ি? তোমার কথাই হচ্ছে।'

'আমার কথা?'

ঘরশোভা হাত দুটো একটু জোড় মতো করে কপালে ঠেকিয়ে বলেন, 'সে চাওয়া আমি চাইব কোন্ মুখে? আমার তো তিনি কোনো খাটুনি দিচ্ছেন না, তাই ছুটি চাইব!'

'ভাল যুক্তি', বলে সত্য শুতে চলে যায়। একে একে ছেলে-বৌরাও চলে যায়। সকলেরই শ্রান্ত ক্লান্ত শরীর। হাই উঠছে।

তবু রাজু সুহাসকে সতর্ক করে দিয়ে যায়, 'দেখো যেন আবার স্বপ্ন-টপ্ন দেখে ভয় না পান। খাট থেকে পড়ে না যান।'

মাজা-ভাঙা সুহাসিনী আশ্বাস দেয়, 'দেখব, দেখব, তোমরা শোওগে তো দাদাবাবুরা!'

স্বপ্ন অবিশ্যি আর সে রাত্রে দেখলেন না ঘরশোভা, তবে সকালবেলা একটু বৈলক্ষণ্য দেখা গেল।

নাতবৌরা যখন 'কী কুটনো হবে ঠাকুমা?' বলে হাঁক পাড়ল, ঘরশোভা বললেন, 'যা আছে দেখেশুনে কুটে নাও ভাই!'

'বাঃ, আমরা কী করব? আমাদের বাবা ওসব মাথায় আসে না।'

'মাথায় তো নিতে হবে? বুড়ি কি চিরকাল থাকবে?'

'আমরা তো তাই ধরে নিয়েছি'—বলে ওরা হাসতে হাসতে

আলু ছাড়াতে থাকে।

ঘরশোভা আর রোজের মতন ওদের হাতের দিকে তাকিয়ে থাকেন না, বলে ওঠেন না, 'ও কী ছিরির সুক্ত কোটা হচ্ছে নাত-বৌ? আনাজ অত কুচোলে ঘন্ট হয়ে যাবে যে!'

সারাদিনই কেমন যেন একটা ছটফটে ভাবে কাটালেন ঘরশোভা, তারপর সন্ধ্যের দিকে তিনি ছেলেকে ডাকলেন।

বললেন, 'এ ঘরে কাউকে আসতে বারণ করো, নির্জনে দুটো কথা বলতে চাই তোমাদের। এ তোমাদের বাপের কলঙ্কের কথা, এ তোমাদের কাছে বলার ইচ্ছে আমার ছিল না, কিন্তু না বলেও পারছি না, বলা দরকার।'

'বাপের কলঙ্ক' শুনেই তো ছেলেদের টাকে ঘাম ফুটে উঠেছে। জগু তাড়াতাড়ি বলে, 'থাক্ মা থাক্, ওসব কথায় কাজ কি? বাবা স্বর্গে গেছেন—।'

'তা জানি!'

ঘরশোভা আস্তে বলেন, 'কিন্তু ভেবে দেখছি প্রকাশ না করলে তোমাদের প্রতি অবিচার করা হবে। আমার মরণের পর পরস্পর পরস্পরকে সন্দেহ করবে তোমরা, তাই প্রকাশ করাই ঠিক করলাম। শোনো, আরো কাছে এস—।'

প্রায় গায়ে কাঁটা দেওয়া অবস্থায় মায়ের বিছানার কাছে সবে এল ওরা।

ঘরশোভা গলা নামিয়ে বললেন, 'চিরদিন তোমরা জেনে এসেছ, আমার বাক্স-ভর্তি সোনাদানা আছে। আমিও সেই কথাই জানিয়ে এসেছি, আজ সত্যি কথা বলি—বাক্সয় কিছু নেই।'

'কিছু নেই!'

একটা যেন আর্তনাদ ওঠে।

ঘরশোভা চুপি চুপি বলেন, 'নাঃ, কিছু নেই, সব ভোঁ ভোঁ ফাঁকা।'

'কিন্তু মা! বাবার কথা কী বলছ?'

'সেই কথাই বলছি—'

ঘরশোভা একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, 'শেষ বয়সে তেজারতির কারবারে নেশা লেগে গিয়েছিল মানুষটার, লাভও হচ্ছিল যথেষ্ট, ওই লাভ থেকেই এল লোভ। একদিন গভীর রাত্তিরে আমায় ঘুমন্ত ভেবে আস্তে আস্তে লোহার সিন্দুক খুলে বাক্স উপুড় করে যাবতীয় গহনা ঢেলে নিয়ে পুঁটলি বেঁধে থলিতে তুলে রেখে আবার বাক্স পুরে ফেলে ভাল মানুষের মতন বিছানায় এসে শুয়ে পড়লেন।···জেগেই ছিলাম, কিন্তু পাথরের মতন হয়ে গিয়েছিলাম। গলা বুজে গিয়েছিল, নিঃশ্বাসও যেন পড়ছিল না। মনে হলো মানুষটা যেন একটা খুন করে হাতের রক্ত মুছে ফের শুলো। উনি ভাবলেন, আমি গভীর ঘুম ঘুমোচ্ছি। আমিও তাই ভান করলাম! শুধু সেই রাত্তিরটুকুই নয়, যাবৎকাল তিনি ছিলেন, ওই ঘুমের ভান করেই কাটিয়েছি। কখনো বলিনি, আমার গহনা! খুলে বার করে দাও তো—'

ঘরশোভা একটু থেমে আবার বললেন, 'শুনতে তোদের কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছি, চিরকাল একরকম জেনে এসেছিস, কিন্তু মারা কিছু যাবে না তোদের, কাগজপত্রে সব আছে। এতটুকু এদিক-ওদিক করিনি, ওনার সুদী কারবারের যত হ্যাণ্ডনোট, পোদ্দারের দোকানের কাগজ, বুঝি না বুঝি—কিছু ফেলিনি। এতাবৎ যত্ন করে রেখে দিয়েছি। এবার সে সব নিয়ে দেখেশুনে যা করার কর। তবে একটা কথা বলে রাখি, গহনাগুলো ছাড়িয়ে নিয়ে, যাকে যেমন দেবার কথা বলেছি, দিবি, আমার কথার খেলাপ যেন না হয়।'

রাজু ব্যাকুল গলায় বলে, 'এতদিন পরে সে সব কোথা থেকে পাব মা?'

ঘরশোভা স্বভাবগত তীক্ষ্ণ ভঙ্গীতে বলে ওঠেন, 'কোথা থেকে আবার? যেখানে আছে, সেখান থেকেই। নাম ঠিকানা সমস্ত সবই তো লেখা আছে।

'কিন্তু সে কি আজকের কথা মা? এখন কি আর—দেবে কেউ?'

'দেবে না মানে?' ঘরশোভা রেগে বলেন, 'লেখার কড়ি বাঘে খায় না, বুঝেছিস? যার দেবার তার ঘাড় দেবে। আর নগদ টাকাও আছে ঢের, কর্জের টাকা উদ্ধার করতে যদি দেরী হয়, ওই টাকা থেকেই সোনাগুলো ছাড়িয়ে নিবি, বিলম্ব করিসনি। ঝি-বৌ সবাই প্রত্যাশা করে বসে আছে!'

মা'র এই কথায় ছেলেরা হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারে না, রুদ্ধকণ্ঠে বলে, 'কিন্তু কোথায় সে সব কাগজ?'

'আছে, সব আছে।'

আছে বৈকি, ঘরশোভাব বিশ্বাসের মধ্যে আছে, চৈতন্যের মধ্যে আছে, নিশ্চিন্ততার মধ্যে আছে।

কিন্তু এদের জন্যে হতাশ নিশ্বাস ছাড়া আর কি রইল?

সেই নিশ্বাস ফেলে জগু বলে, 'একটা কথা তোমায় বলি মা, কারুর টাকা তার অবর্তমানে ব্যাঙ্ক থেকে তোলার অনেক ঝকমারি। তুমি যদি সময় সুবিধে মতো টিপছাপ দিয়ে ওটা তোলার ব্যবস্থা করে দাও—।'

সময় সুবিধেই বলে জগু। মা'র 'সময়' অফুরন্ত, এটাই যে জানা হয়ে গেছে তাদের।

কিন্তু ঘরশোভা ছেলেদের তাণ্ডব করে বললেন, 'ব্যাঙ্কে-ট্যাঙ্কে কিছু নেই বাবা, বাড়িতেই আছে। মরণের দিনই তো নিয়ে এসে আমার হাতে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'যেতে বসেছি পুন্যির মা, এই যত যা পারি উদ্ধার করে এনে দিলাম।' ব্যাঙ্কে আর কে রাখতে গেছে?'

'ব্যাঙ্কে নেই! বাড়িতেই আছে।'

তিনটে হাপর থেকে যেন তিন ঝলক আগুনের ঝলক বেরোলো। এত কষ্ট যাচ্ছে তাদের, ক্রমশই দিন চলা ভার হয়ে উঠেছে, সে দৈন্য দারিদ্র্য দেখতেও পাচ্ছেন ঘরশোভা, অথচ অনেক টাকা

বাড়িতেই আছে। কোথায় আছে সে বস্তু? লেপের চালিতে? দেয়ালের গহ্বরে? না কি ওই লোহার সিন্দুকটার মধ্যেই? যার চাবিটা একদিনের জন্যেও ঘরশোভা কোমরের ঘুনসি ছাড়া করেননি।

সেই অনেকটা কতখানি?

কাণ্ডজ্ঞানহীন অবোধ ঘরশোভা কতটুকুকে অনেক বলছেন?

ছেলেরা কষ্টে বলে, 'কত সময় কত অভাব অসুবিধে গেছে—'

'জানি বাবা,' ঘরশোভা সস্নেহে বলেন।

'অনেক সময়ই মনে হয়েছে, দিই বার করে, কিন্তু মনের জোর করে চেপে রেখেছি, ভেবেছি, অভাব বস্তুটা তো কুম্ভকর্ণের হাঁ-এর মতো, খেয়েই বলে, আর কই? তবে এমন সময় দেবো যাতে মায়ের অভাবটার একটু লাঘব হবে।' একটু হাসলেন ঘরশোভা, 'তোরা যখন ছোট ছিলি, তোদের ফেলে রেখে কোথাও বেড়াতে গেলে যেমন খেলনাপাতি দিয়ে ভুলিয়ে রেখে যেতাম।'

রাজু একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, 'একটা রূপকথার গল্প শোনালে মা। কিন্তু একবারও যদি সেসব কাগজপত্র দেখাতে—'

ঘরশোভা আস্তে বলেন, 'বলি বলি করেও পারিনি বাবা, কথায় বলে—পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম—সেই পিতাকে তোদের সামনে ছোট করে দিয়ে, আমি কোন্ মুখে আবার বড় মুখ করে দাঁড়াবো তোদের সামনে? আমার সমুখে বসে তোরা যে ভাববি, আমাদের বাবা সুদখোর ছিল, চোর ছিল, সে আমার সইত না।'

ক্লান্তিতে চোখ বুজলেন ঘরশোভা, তারপর আস্তে বললেন, 'এখন বলছি, তার কারণ, টের পাচ্ছি আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে—হঠাৎ মরে গেলে, তোরা জানতে পারবি না কোথায় কি! সিন্দুক খুলে যখন দেখবি সব ফাঁকা—তখন অবাক হয়ে একে অপরকে সন্দেহ করবি। ভাইয়ে ভাইয়ে মনোমালিন্য আসবে। আর কাউকে বলার দরকার নেই, শুধু তোমরা তিন ভাই জানলে—।'

কথা বলতে বলতে হঠাৎ যেন ঘুমিয়ে পড়লেন ঘরশোভা।

তিন ছেলেই ব্যস্ত হয়ে ডাকল, 'মা মা! টাকাটা কোথায় বললে?'

ঘরশোভা আর উত্তব দিলেন না। শুধু একবাব ফ্যালফ্যাল করে তাকালেন। আবাব চোখ বুজলেন।

শেষরাত্রে মারা গেলেন ঘবশোভা দেবী। ছিয়ানব্বুই বছবে পা দিয়ে।

দাহটাহ করে এসে তিন ভাইয়ে যখন ঘরে প্রদীপ জ্বেলে নিয়ে বসেছে, রাজু বলল, 'কিন্তু মা চিবকাল ওই গহনাগুলোব গল্প করলেন কেন তাই ভাবছি।'

জগু বলল, 'প্রাণ থেকে তো তাদেব হাবাননি, ভেবেছেন সব আছে।'

পান্নুই শুধু বলল, 'তা মনে হয় না। মনে হচ্ছে ওই গহনাব বাক্সটাকেই পায়ের তলাব মাটি কবে দাঁড়িয়েছিলেন মা।'

'ও কথা থাক্‌······একটা কথা—' বাজু বলে, 'মা চিবদিন বাবার দোষের কথা চেপে থাকলেন। আমবা যেন আমাদেব মা'ব এই কথা ব্যক্ত করে না বসি। লোকে জানুক—কবে কখন সিন্দুক থেকে চুরি গেছে!'

পান্নু বলে ওঠে, 'দিদিবা বলবে, আমবাই চুবি কবেছি, আব বৌরা ভাববে—'

'যে যা ভাবে ভাবুক।'

ঘরশোভার বড় ছেলে বলে, 'মায়ের নামে বদনাম সইব না।'

কিন্তু নগদ টাকাটা?

সেটা কোথায় খোঁজা হবে? বাড়ি তো এখন লোকে লোকারণ্য।

ঘরশোভার তিন মেয়েই এসে গেছে, এসেছে তাদেব স্বামী পুত্তুর নাতি-নাতনী। ঘরশোভার ছেলেদের বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়েরাও এসেছে। আর সকলেই এখন উল্টো গাইছে—পালঙ্কটার দিকে

তাকানো যাচ্ছে না।...নামে রূপে এক ছিলেন তো, এই একশো বছরের কাছে এসে, তবু রং যেন জ্বলত।'

পুণ্য আবার একথাও বলল, 'এই তো দু' দিন আগে গেছি, কত তোয়াজ করে ভাত খাচ্ছেন, এত শীগগির চলে যাবেন তা ভাবিনি।'

সবাই তো এই দালানেই, কোন ফাঁকে তবে খোঁজাখুঁজি করা যাবে?

তাছাড়া—যারা এসেছে সবাই তো ঘরশোভার সিন্দুক খোলার অপেক্ষায় উৎসুক, কী বলা হবে তাদের?

জগু বলল, 'বলার কী আছে? সবাইয়ের সামনে খোলা হোক, দেখুক!'

হলো খোলা।

কিন্তু সবাই তো আর ঘাসের বীচি খায় না? আর ভাগীদারের আড়ালে ভরা বাক্সখানি হাট করে রেখে, তাদের সামনে খালি বাক্স দেখানোর ঘটনাও জগৎ-সংসারে কিছু নতুন নয়।

শ্রাদ্ধ পর্যন্ত আর এ বাড়িতে রইল না মেয়েরা। পুণ্য বলে গেল, 'খুব দেখালি যাহোক তোরা! তবে তোরা যে এত ছোটলোক হতে পারবি, তা ভাবিনি।'

আলো বলে গেল, 'ভগবান আমার কিছু অভাব রাখেনি, মা'র একখানা গহনা—পেয়ে রাজা হয়ে যেতাম না, তবে মা'র স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রাখতাম—।'

আর দিব্য বলে গেল, 'ছেলেদের ফাঁকি দিয়ে যদি বড়লোক হতে পারিস তোরা, তবে হ।'

কিন্তু ঘরশোভার নাতিরাও যে তাদের বাপ-কাকাকে সন্দেহ করছে। নাতবৌরা শাশুড়ীদের।

কে যে নাটের গুরু, তা বুঝতে পারছে না কেউ।

একটি মিথ্যার জাল দিয়ে সমস্ত সংসারকে বেঁধে রেখেছিলেন ঘরশোভা, সেই জালটা ছিঁড়ে পড়েছে।

'সেদিন সন্ধ্যেবেলা দরজা বন্ধ করে ওই কর্মই হয়েছে বোধ হয়—' সত্য আর নিত্য বলে, 'পাছে কাউকে ভাগটাগ দিতে হয়, তাই রাতারাতি সরানো হয়ে গেছে আর কি !'

'কী এত কথা হলো মা'র সঙ্গে ? সেদিনই এ প্রশ্ন করতে মলিনা, সরস্বতী আর পঙ্কজিনীর মুখ ব্যথা হয়ে গেছে, জবাব আদায় করতে পারেনি তারা নিজ নিজ স্বামীর কাছে—তারপর কথা বন্ধ করেছে। ভাইয়ে ভাইয়ে এত ভাব ? স্ত্রীর থেকে ভাই বেশি আপনার হলো ?

কিন্তু ঘরশোভার ছেলেরা অটল।

শুধু নিজেরা নিজেরা নিভৃতে বলাবলি করে, নগদ টাকাটার কথা—ভুলের কথা বলেই—মনে হচ্ছে। মৃত্যুকালে কিছুটা ভুল-ভাল তো হবেই। সিন্দুকের গোপন ঘর দোর সবই তো দেখা হলো।

কিন্তু একটা জায়গা দেখা হয়নি, সেটা হচ্ছে ঘরশোভার সেই তিন হাত উঁচু পালঙ্কের খান চার-পাঁচ গদির সব নিচের গদিটার তলা।

অশৌচান্তের সময় ওপরকার গদি তোশক সব ধোওয়া কাচা হয়েছিল, তলার সেই বীরভদ্রটা আর তোলা হয়নি। হলো— যেদিন আবার খাট খোলাতে ছুতোর এল।

আর তো দালান জোড়া করে এই ময়ূরপঙ্খী পালঙ্ক রাখার মানে হয় না।

গদি তোলার সঙ্গে সঙ্গে মেজেয় ছড়িয়ে পড়ল গোছা গোছা হাজার টাকার নোট, আর জীবনবল্লভের তেজারতি কারবারের গোছা গোছা হাত-চিঠ, হয়তো বা পোদ্দারের দোকানের কাগজ।

কুড়িয়ে কুড়িয়ে এনে দিচ্ছিল নিত্য ; পানু হাত নেড়ে বলে, 'ফেলে দাওগে। ওসব আর কাজে লাগবে না, ছেঁড়া কাগজ হয়ে গেছে।'

হাতচিঠগুলো ?

তামাদি হয়ে গেছে।

পড়ল !

শ্চর্য, অথচ তার ওপর ভক্তি কমেনি, ভালবাসা কমেনি। একটা রহস্য।

শুধু মানুষের প্রতি অবিশ্বাসের ওই বদ্ধমূল ধারণাটা বসে জীবনের শিকড়ে। কিন্তু একবারের জন্যেও যদি আপন উপর অবিশ্বাস আনতেন ঘরশোভা !

তাহলে একেবারে মূল্যহীন হয়ে যাওয়া ওই ভয়ঙ্কর মূল্যবান নসগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে জোরে মাথা ঠুকতে ইচ্ছে ত না ঘরশোভার ছেলেদের। যে দেহটাকে কিছুদিন আগে ড়িয়ে ছাই করে দিয়ে এসেছে, তার পায়ে মাথা খুঁড়ে বলতে চ্ছে করত না—মাগো, এ তুমি কী করেছ বসে বসে ?

নাতিরা জনে জনে এক একবার করে জিনিসগুলো উল্টেপাল্টে খে বুঝতে চেষ্টা করে, কোনোখানে কিছু আশা আছে কি না।

না। আশা নেই।

চম্পাকলির 'গাছতলায় বসা উকিল বর' ভাল করেই বুঝে ছে একথা। বুঝিয়েও দিয়েছে সবাইকে।

মাথা ঠুকতে ইচ্ছে করছে, তবু স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে ঘরশোভার টি প্রৌঢ় পুত্র। কতকাল যারা ভাল করে টাকা চোখে দেখেনি, যাদের মা মনে মনে ভেবে রেখেছে—'দেখাবো, আমি মরে